প্রবেশ নিষেধ

নিমাই ভট্টাচার্য

মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৬৯

প্রকাশিকা ঃ লতিকা সাহা। মডার্ন কলাম। ১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯

মুদ্রাকর ঃ অনিলকুমার ঘোষ। নিউ ঘোষ প্রেস। ৪/১ই বিডন রো, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ ঃ বিজন ভট্টাচার্য

প্রবেশ নিষেধ

'কি আশ্চর্য ! তুমি এখনো ঘুমোচ্ছ ?'

অম্বর ঘুমুচ্ছে না। তন্দ্রার আবেশে স্বপ্নের মধ্যে ডুবে আছে। রোজই থাকে। রোজ সকালে। ভোরের দিকে মিঠু উঠে যাবার পর সকালবেলার সলজ্জ রোদের প্রথম আত্মপ্রকাশের সময় ও রোজ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে বিছানায় পড়ে থাকে। স্বপ্ন দেখে। মিঠুর বালিশ দুটোতে মুখ গুঁজে ওর গন্ধ, সৌরভ উপভোগ করতে করতে স্বপ্ন দেখে। হাত, পা ঘোরাঘুরি করে। মিঠুকে খুঁজে বেড়ায়। সারা রাত্রি ধরে পূর্ণ হয়েও কেমন একটা অপূর্ণতার স্বাদ, বিস্বাদ পায় অম্বর। আর একটু, আর একবার, মাত্র কয়েকটা টুকরো টুকরো মুহূর্তের জন্য মিঠুকে কাছে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তাইতো ঘুম চলে যায় কিন্তু নেশা ভাঙে না।

আশ্চর্য। সত্যি আশ্চর্য। মানুষ যেন কিছুতেই সুখী হতে জানে না। পারে না। কিছুতেই যেন মানুষের মন ভরে না। তা না হলে এই ভোরবেলায়, রোজ সকালে মিঠুকে আবার একটু কাছে পাবার জন্য অম্বর এমন করে ওকে খুঁজে বেড়ায় ? অথচ ও জানে মিঠুকে এখন পাবে না, পেতে পারে না। মিঠু যেন হাস্নাহানা। দিনের আলো ফুরিয়ে যাবার পর, রাত্রির অন্ধকার গাঢ় হলেই ওকে কাছে পাওয়া যায়, ওর সৌরভ উপভোগ করা যায়। চাঁপা-চামেলী-রজনীগন্ধাকে দিনে পাওয়া যায়, রাতে পাওয়া যায়, কিন্তু হাস্নাহানা ভোরের শিশিরের আঘাতটুকু পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না। তা হোক। ঐ রাত্রিটুকুতেই মন ভরিয়ে দেয় হাস্নাহানা। মিঠুও। তবুও অম্বর মনে মনে ঠিক তৃপ্তি পায় না। পূর্ণকুম্ভে স্নান করেও যেন মনের কুম্ভ পূর্ণ হয় না।

মিঠু এগিয়ে এসে অম্বরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো, 'কি হলো ? উঠবে না ?'

'এক্ষুনি ?'

মিঠু হাসে। 'কটা বাজে জান ?'

'কটা ?'

'পৌনে নটা।'

'বাজুক গে। তুমি একটু কাছে আসবে না ?'

'কাছেই তো দাঁড়িয়ে আছি।'

চোখ দুটো বন্ধ করেই অম্বর এক হাত দিয়ে মিঠুকে কাছে টানতে চায়। 'এসো না একটু কাছে।'

'অনেক হয়েছে। এবার ওঠ তো।'

'আজ তো রবিবার।'

'তাই বলে কি এখন আবার তোমার পাশে শুতে হবে ?' অম্বরের মনের কথা জেনেই মিঠু হাসতে হাসতে প্রশ্ন করে।

এবার অম্বর চোখ মেলে মিঠুকে দেখে। 'তুমি অত ভোরে ওঠ কেন বলো তো ?'

মিঠু আবার হাসে। 'ভোরে উঠলাম কোথায় ?'

'ভোরেই তো উঠলে।'

'জান ক'টায় উঠেছি ?'

'ক'টায় ?'

'সওয়া আটটায়।'

'মোটেও না। তখন বেশ অন্ধকার ছিল।'

মিঠু জানে একটু পাশে না বসলে ও বিছানা ছেড়ে উঠবে না। পাশে বসে অম্বরের গায়ে হাত দিতে দিতে বললো, 'উঠতে গেলেই তুমি এমন করে জড়িয়ে ধর যে উঠতে পারি কই ?'

বালিশ ছেড়ে মিঠুর কোলের উপর মুখ রেখে দু' হাত দিয়ে ওর কোমর জড়িয়ে ধরে অম্বর বললো, 'ভোরে না উঠলে অত অন্ধকার থাকে ?'

মুখ টিপে টিপে হাসতে হাসতে মিঠু জবাব দেয়, 'জানালা-দরজায় অত মোটা মোটা পর্দা থাকলে আলো আসবে কোন্‌খান দিয়ে ?'

'ঠিক আছে। আজ থেকে পর্দা না টেনেই দেখব।'

'তা তো বটেই। পর্দা না টেনে এই ঘরে শোওয়া যায়?'

'কেন যাবে না?'

'তুমি বোধহয় আমাকে নিয়ে কনট প্লেসেও শুতে পার।'

অম্বর এবার মুখ তুলে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আর তুমি বোধহয় এই বেডরুমেও শুতে না হলে বেঁচে যাও।'

'আমি যেদিন তোমার কাছে শোব না সেদিন তোমার মাথার ঠিক থাকবে?'

'তুমি কি ভেবেছ বলো তো?'

'কিচ্ছু ভাবি নি। এবার ওঠ। আমি চা আনতে যাই,' দুটো বালিশ টেনে আলতো করে অম্বরের মাথা ওর উপর রেখে মিঠু চা আনতে চলে গেল।

উপুড় হয়ে বালিশ দুটো জড়িয়ে অম্বর পূর্ণ হয়েও পরিপূর্ণ হবার নেশায় বিভোর হয়ে পড়ে রইল। উঠল না। উঠতে পারল না।

'হা ভগবান! তুমি এখনো শুয়ে আছো?' ছোট্ট ট্রেতে দু'কাপ চা আর একটা স্যস্যারে কয়েকটা বিস্কুট নিয়ে বেডরুমে ঢুকেই মিঠু অবাক হলো।

অম্বর বালিশ থেকে মুখ তুলে মিষ্টি একটু হাসি হাসতে হাসতে বললো, 'জান, তুমি উঠে যাবার পরও সারা বিছানায় অনেকক্ষণ তোমার মিষ্টি গন্ধ লেগে থাকে।'

'আমি উঠে যাবার পর বোধহয় অন্য অনেক বান্ধবীর কথা মনে পড়ে বলে বেশী মিষ্টি লাগে, তাই না?' ট্রে টিপয়ে নামাতে নামাতে মিঠু টিপ্পনী কাটল।

অম্বর অবাক হয় না। রাগ করে না। বরং স্বাভাবিক মনে হয়। যে স্ত্রী স্বামীকে সন্দেহ করে না, সে স্বামীকে ভালবাসে না।

'প্রেম গলি বহু সাঁকরি, ইহি মা দুই না সমায়। প্রেমের গলি বড় সরু এখানে দু'জন পাশাপাশি হাঁটা যায় না, তাই না মিঠু?'

'আমি পারি না বলে কি, তুমিও পারবে না? তুমি ঠিকই পার।'

অম্বর শুয়ে শুয়েই একটা পেয়ালা তুলে চুমুক দিয়ে বললো, 'তাই নাকি ?'

মিঠুও আরেকটা পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললো, 'তবে কি ?' তুমি দু-চারটে "শের" শিখেছ বলে কি যা বলবে তাই ঠিক ?'

'আমি কি তাই বলেছি ?'

'অন্তত ভাবখানা সেই রকম। এবার আমি তোমার মনের কথা বলি ?'

'তার মানে ?'

'তোমার কথা তুমিই জান না ?'

'না।'

'তবে শোন—হয় গলিপে হ্যায় মেরে মজার, জাঁহা পে দেখা হুস্ন ঐহি মর গ্যায়া। বুঝলে ?'

'না।'

'তা কেন বুঝবে ? বলছিলাম সমস্ত গলিতেই তোমার কবর। কারণ যেখানেই সুন্দরী দেখেছ, সেখানেই মরেছ।'

'শেরটা সত্যি সুন্দর কিন্তু আমি তো ঐ গৌরবের অধিকারী না।'

'কেন ? দুঃখ হচ্ছে বুঝি ?'

'হলেও তো উপায় নেই। তুমি তো আর কাছে এসে আদর করে সান্ত্বনা জানাবে না।'

'অঙ্গার শত ধৌতেন···'

'অম্বরকে না টেনে অঙ্গারকে টানছ কেন ?'

অম্বরের কথায় মিঠু না হেসে পারে না। 'কি করব বল ? তোমার যা স্বভাব।'

সীমাহীন আকাশ, উদার প্রান্তর, মৌনী হিমালয়কে উপভোগ করার সুযোগ পায় না অম্বর। আগে পেত। মন ভরে যেত। মনের মধ্যে বিন্দুমাত্র অতৃপ্তি থাকে নি। এখন স্নিগ্ধ রাত্রির মধ্যেই প্রকৃতির অকৃপণ ঔদার্যের নিবিড় স্পর্শ অনুভব করে। উপভোগ করে। শতরূপা প্রকৃতি যেন মিঠুর মধ্যে বন্দিনী হয় রাতের অন্ধকারে।

তাই তো সূর্য ওঠার পর রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি হতে অম্বরের এত দ্বিধা, এত সঙ্কোচ। বিছানা ছেড়ে ওঠার আগে এইরকম একটু নাটক চাই-ই। হবেই। ছুটির দিনে একটু দেরিতে, একটু বেশী।

চা খাওয়া শেষ হলো। অম্বর আবার মিঠুর কোলে মাথা রাখল।

'উঃ। আবার।'

'কেন কি হলো?'

'উঠবে না?'

'ব্যস্ত কি?'

'তাই বলে এত বেলায় কোলে মাথা রেখে শোবে?'

'তোমার কোলে শোবার আবার বেলা-অবেলা আছে নাকি?'

'তুমি বাচ্চাদের মতো বড্ড গা ডলতে পার।'

'ভীষণ ভাল লাগে।'

'তাই বলে সব সময়?'

'সব সময় কোথায়?'

'সারা রাত্তির কিভাবে শুয়ে থাক তা জান?'

কিভাবে?'

'জানি না। অত আমি বলতে পারব না।'

অম্বর জানত ও বলতে পারবে না। তবু জিজ্ঞাসা করেছিল। শুনতে পারলে ভাল লাগত।

'জান মিঠু, শৈশব আর কৈশোর মিলিয়েই তো যৌবন। সুতরাং……'

কথাটা শেষ করতে দিল না মিঠু। 'আর না, এবার ওঠ।'

মিঠু চলে যায়। অম্বর উঠে পড়ে। দিন শুরু হয়।

আজ রবিবার হলেও নিয়ম এক। কুন্দন সিং বাজারে। মিঠু রান্নাঘরে। অম্বর বাথরুমে। তারপর ব্রেকফাস্ট। অন্য দিন লিভিং রুমে ডাইনিং টেবিলে। ছুটির দিন বারান্দায় পিপিং চেয়ারে বসে। কারণ আছে। সুজন সিং পার্ক একেবারে শহরের মাঝখানে হলেও ফ্ল্যাটগুলো বেশ

পুরানো ধরনের। লিভিং রুমটা প্রায় হল ঘর কিন্তু দুটো বেডরুমই বেশ ছোট ছোট। বাথরুমটাও বেশ স্যাঁতসেঁতে। ঘরগুলোতে আলো আছে, বাতাস আসে না। একটা বেডরুমে আর লিভিং রুমে সামান্য রোদ্দুর আসে। তাই ছুটির দিন বারান্দায় বসে ব্রেকফাস্ট খেতে বা গল্পগুজব করতে সত্যি ভাল লাগে। গরমের দিন সন্ধ্যার পর এই বারান্দায় বসে ওরা গল্পগুজব করে, রাত্রের খাওয়াদাওয়াও সেরে নেয়।

সুজন সিং পার্কে ফ্ল্যাট পাওয়া এক কথায় অসম্ভব। বোধহয় এইগুলিই নিউদিল্লীর প্রথম বেসরকারী ফ্ল্যাট বাড়ি। পাণ্ডারা রোড পার হলেই ইণ্ডিয়া গেট। পশ্চিমের দিকে পাঁচ মিনিট হাঁটলেই লোদী গার্ডেন। পাশেই গল্ফ লিঙ্ক। রাস্তার ওপারেই অ্যাম্বাসেডর হোটেল আর খান মার্কেট। সুজন সিং পার্কের পিছনে, খান মার্কেটের সামনে সরকারী অফিসারদের কোয়ার্টার। এক কথায় আইডিয়াল জায়গা কিন্তু ফ্ল্যাট ফাঁকা পাওয়া সত্যি অসম্ভব। অম্বর তবু পেয়েছে। পেয়েছে মানে একজন দিয়েছেন। হাজার হোক রায়সাহেব তারাপ্রসন্ন সরকারের নাতি।

আজকের কথা নয়। অনেক দিন আগের কথা। এনট্রান্স পরীক্ষায় পাস করার পরই নিঃসন্তান বড় মাসীর সঙ্গে তীর্থে বেরিয়েছিলেন তারাপ্রসন্ন। প্রথমে কাশী, তারপর প্রয়াগ। সেখান থেকে মথুরা-বৃন্দাবন। সব শেষে হরিদ্বার। ঠিক ছিল দু'তিন দিন থেকেই কেষ্টনগরে ফিরবেন কিন্তু মন চাইল না। সন্ধ্যার পর গঙ্গার আরতি দেখে আশা মেটে না বড় মাসীর। মথুরাদাস পাণ্ডাও ছাড়তে চায় না। তারাপ্রসন্ন বড় মাসীর সঙ্গে আরো ক'দিন হরিদ্বারে থেকে গেলেন। ভালই লাগল তারাপ্রসন্নর। মাসীর আঁচল থেকে সিকি-আধুলি চুরি করে পাসিং শো সিগারেট আর চা খেয়ে বেশ কাটছিল দিনগুলো। বিধির বিধান কে খণ্ডাবে। একদিন সন্ধ্যায় গঙ্গার আরতি দেখতে গিয়ে আলাপ হলো বরদাকান্ত সর্বাধিকারীর সঙ্গে।

'ক'দিন ধরেই তোমাকে দেখছি কিন্তু আলাপ করা হয়ে ওঠে নি.....

বরদাকান্ত কথা শেষ করার আগেই তারাপ্রসন্ন সপ্রতিভ হয়ে বললো, আজ্ঞে আমার নাম শ্রীতারাপ্রসন্ন সরকার।

'মাকে তীর্থে নিয়ে এসেছ বুঝি?'

'আজ্ঞে না। উনি আমার মাসী।'

'বাড়ি কোথায়?'

'আজ্ঞে কেষ্টনগরে।'

মেয়ের দল আরতি দেখছেন। এরা গল্প করে চলেছেন।

বরদাকান্ত জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি কর বাবা?'

'আজ্ঞে আমি এনট্রান্স পাস করেছি।'

অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে বরদাকান্ত বললেন, 'বাঃ! ভাল কথা।' একটু থেমে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এবার কি করবে?'

'আগে তো ফিরে যাই তারপর······'

'এত দূর এসে ফিরে যাবে কেন? এদিকেই একটা চাকরি-বাকরিতে লেগে পড়।'

একটু অবিশ্বাসের হাসি হেসে তারাপ্রসন্ন বললো, 'কি যে বলেন আপনি? এখানে আমাকে কে চাকরি দেবে?'

'কে আবার চাকরি দেবে? দেবে সরকার বাহাদুর।'

'কিন্তু আমি তো কাউকে চিনি না, জানি না······'

'তাহলে আমরা আছি কি করতে?'

এই বরদাকান্তের আগ্রহেই নব্য যুবক তারাপ্রসন্ন সরকার হিজ ম্যাজেস্টিস গভর্নমেন্টের খাতায় নাম লেখালেন। এখন এসব আরব্য উপন্যাসের কাহিনী মনে হলেও তখনকার দিনে বরদাকান্তের মতো বাঙালী বাবুরা ডেকে ডেকে চাকরি দিতেন। দিতে পারতেন। এদেরই আগ্রহে ও প্রচেষ্টায় সেকালে দিল্লী-সিমলা বাঙালীবাবুতে ভরে যায়।

কেষ্টনগর বা মুড়োগাছা তো দূরের কথা, এই দিল্লীতেও তারাপ্রসন্নকে নিয়ে আলোচনার শেষ নেই। হয়তো কারণও আছে। কিন্তু একথাও ঠিক তারাপ্রসন্ন সরকার সত্যি মরদের বাচ্চা ছিলেন। এনট্রান্স

পাস করে মাত্র সাতাশ টাকা মাইনেতে হিজ ম্যাজেষ্টিস সেবা শুরু করেন। আর শেষ?

তারাপ্রসন্ন অম্বরকে বলতেন, জানিস দাত্থু, পলিটিক্যাল ব্যাকিং থাকলে আমিও ভি. পি. মেননের মতো গভর্নর হতাম। তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে প্রায় আপন মনে বলতেন ভি. পি. গভর্নর হলো আর আমি ডেপুটি সেক্রেটারী হয়ে জীবন শেষ করলাম।

অম্বর তখন অত কিছু বুঝত না। তবে এটুকু বেশ বুঝতে পারত দাত্থু লাটসাহেব না হলেও কম কিছু না। তাইতো দাত্থুকে সান্ত্বনা দিত, সে যাই হোক তুমিও কি কম বড়!

অম্বরের কথা শুনেও যেন শুনলেন না বৃদ্ধ তারাপ্রসন্ন। 'একটু উপর তলায় যদি বরদাকান্তর মতো কাউকে পেতাম তাহলে সত্যি জীবনে কিছু করতে পারতাম।'

অম্বরের কথাটা ঠিকই। সাতাশ টাকা মাইনেতে জীবন শুরু করে ডেপুটি সেক্রেটারী হয়ে রিটায়ার করা কম কৃতিত্বের কথা নয়। সে কৃতিত্বের কথা আর কেউ স্বীকার না করলেও অম্বর করে। কারণ ছোটবেলা থেকে দাত্থুর সঙ্গে এই দিল্লী ঘুরতে ফিরতে অজস্র কাহিনী শুনেছে। জেনেছে। দেখেছেও অনেক কিছু।

তারাপ্রসন্ন যখন চাকরি নিলেন তখন লর্ড চেমসফোর্ড দিল্লীর মসনদে অধিষ্ঠিত। এরই রাজত্বকালে অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগে চারশ' নিরস্ত্র মানুষকে মশা-মাছির মতো মারল জেনারেল ডায়ার। অম্বর দাত্থুর কাছে শুনেছে ডায়ার দেশে ফিরে গেলে শত শত ইংরেজ যুবতী ওকে সারা রাত নাচ দেখায় ও গুণমুগ্ধরা দশ হাজার পাউণ্ড উপহার দেয়! আরো কত কি হলো। মণ্টাগু-চেমসফোর্ড রিফর্ম, তৃতীয় আফগান যুদ্ধ। ঘটনার পর ঘটনা। রবীন্দ্রনাথ নাইটহুড ত্যাগ করলেন, আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করলেন গান্ধীজি। খলিফার সাম্রাজ্য তুরস্ককে টুকরো টুকরো করার প্রতিবাদে শুরু হলো খিলাফৎ আন্দোলন। দেশব্যাপী রাওল্যাট অ্যাক্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

এই সব ঝামেলার মাঝখানে কবে যে চেমসফোর্ড চলে গেলেন আর

রিডিং এলেন, তা কেরানী তারাপ্রসন্ন খেয়াল করলেন না। র‍্যাওল্যাট আইন বাতিল হলো তাও গ্রাহ্য করলেন না, কিন্তু হঠাৎ আর্মিতে ইণ্ডিয়ানরা অফিসার হতে শুরু করায় চমকে উঠলেন। এই লর্ড রিডিং-এর অনুগ্রহে ভারত সরকারের নানা বিভাগে বহু ভারতীয়দের পদোন্নতি হলো। তারাপ্রসন্নরও অদৃষ্টে লর্ড রিডিং-এর একটু চরণামৃত জুটল।

অম্বরের হাত ধরে কার্জন রোড দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে হেইলি রোড দেখিয়ে তারাপ্রসন্ন জিজ্ঞাসা করতেন, 'এই রাস্তাটার নাম জানিস দাদু?'

'এটা তো হেলি রোড। তোমার বন্ধু তো এই গলিতেই থাকেন।'

'তোর সে কথাও মনে আছে?'

'কত বড় বাঘের সঙ্গে তোমাদের ছবি আছে ঐ বাড়িতে...'

এই হেইলি রোডেই দেওয়ান গোবিন্দ সিং-এর বাড়ি। রায়সাহেব তারাপ্রসন্ন সবকারের অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বহু দেশীয় রাজ্যে ঘুরেছেন। আলোয়ার থেকে জামনগর, জুনাগড়। উনি যখন ভরতপুর মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন তখন হিজ ম্যাজেষ্টিস গভর্নমেণ্টের পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের আণ্ডার সেক্রেটারী রায় সাহেব তারাপ্রসন্ন সরকারকে মাঝে মাঝেই ভরতপুর যেতে হতো। আগে পরিচয় থাকলেও বন্ধুত্ব হয় এই সময়। একবার বড়দিনের ছুটিতে হিজ হাইনেসের আমন্ত্রণে মহারাজার সঙ্গেই বাঘ শিকারে গিয়েছিলেন। আসলে এক ছোকরা এ-ডি-সি-র গুলীতেই বাঘটা মারা যায় কিন্তু বেটপ মাতাল মহারাজাও সূর্যের দিক লক্ষ্য করে একটা গুলী ছুঁড়েছিলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এবং সেজন্য সবাই মুক্তকণ্ঠে ও সানন্দে স্বীকার করল হিজ হাইনেসের গুলীতেই বাঘ মরেছে।

'সূর্যের দিক লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়েছিলেন মানে?' অম্বর জানতে চায়।

রায়সাহেব একটু হাসেন। না হেসে উপায় কি? প্রাসাদের মধ্যে সখীদের নিয়ে স্ফুর্তি করতে ভাল না লাগলেই হিজ হাইনেসের মাথায়

উদ্ভট চিন্তা আসত। বড়দিনের ছুটিতে হিজ ম্যাজেস্টিস গভর্নমেন্টের পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টের কিছু ইংরেজ অফিসারদের নেমন্তন্ন করতেই হতো। সেবার বড়দিনের ছুটিতে বাঘ শিকারের আয়োজন হয়। আয়োজনেব কোনো ত্রুটি না থাকলেও শিকারে কারুরই আগ্রহ ছিল না। খাওয়া-দাওয়া ও মদ্যপানের এলাহি ব্যবস্থা ছাড়াও প্রত্যেক তাঁবুর জন্যে আলাদা আলাদা সুন্দরী বাইজী থাকলে শিকারে কার না আগ্রহ থাকতে পারে? আর হিজ হাইনেস? সারা দিনই গাছের ছায়ায় সখীদের লীলা উপভোগ করতেন। হঠাৎ সূর্যের আলো চোখে পড়ায় হিজ হাইনেস এক প্রিয় বান্ধবীর নাচ ঠিক মতন উপভোগ করতে না পারায় নেশার ঘোরে সূর্যকে লক্ষ্য করেই গুলী ছুঁড়লেন। ঠিক কয়েক মুহূর্ত আগেই কয়েক শ'গজ দূরে এ-ডি-সি-র গুলীতে বাঘ মারা যায়। এসব কথা তো নাতিকে বলা যায় না; তাই তারাপ্রসন্ন শুধু বললেন, 'রাজা-মহারাজাদের খেয়ালখুশীর কি কোনো মাথামুণ্ডু থাকত?'

সত্যি রাজা-মহারাজাদের কাণ্ডকারখানার কোনো মাথামুণ্ডু থাকত না।

একবার ভরতপুরের এক জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে আইরিশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের কর্নেল স্নো এক ডাকাত দলের মুখোমুখি হন। দু'দিক থেকেই রাইফেলের গুলী চলল। কর্নেল সাহেবের পায়ে গুলী লাগলেও পরের দিন সকালে নয়ন সিং নামে এক বিখ্যাত ডাকাতকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। কর্নেল স্নো নয়ন সিং' এর মৃত দেহ নিয়ে সোজা দিল্লী চলে এলে সরকারী মহলে চাঞ্চল্য পড়ে যায়। বড়লাটের মিলিটারী সেক্রেটারী মেজর জেনারেল হাডসন পর্যন্ত ডাকাতের ডেড বডি দেখতে এসে কর্নেলকে অভিনন্দন জানালেন আর এই ডাকাতের ব্যাপারে সব কিছু তন্নতন্ন করে তদন্ত করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিলেন। হোম আর পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টের অফিসারদের ঘুম চলে গেল ক'দিনের জন্য।

সব কিছু তদন্ত করার পর জানা গেল মোট একুশটা ডাকাতি আর তিনটে খুন করার দায়ে ভরতপুরের প্রধান বিচারপতি নয়ন সিং'কে

মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলেও মহারাজা তাকে ছেড়ে দিয়েছেন।

কেন?

শুরু হলো গোপন তদন্ত। জানা গেল রোজ সকালে সমস্ত জরুরী সরকারী কাগজপত্র মহারাজার কাছে পাঠানো হয়। মহারাজা মহারানী বা সখীদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করতে করতে একজন কোনো সখীকে বলতেন ফাইলগুলো দু'ভাগে ভাগ করতে। সখী ডান দিকে যেসব ফাইল রাখতেন সেগুলো মহারাজার সম্মতি বা কৃপা লাভ করতো আর বাঁ দিকের ফাইলগুলো মহারাজার সম্মতি লাভ করতো না। নয়ন সিং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েও মহারাজার অসম্মতির জন্য মুক্তিলাভ করে।

আরো কত বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে কিন্তু তারাপ্রসন্ন কথার মোড় ঘুরিয়ে অম্বরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'জানিস এই হেইলি সায়েব কে ছিলেন?'

'না জানি না তো।'

'স্যার ম্যালকম হেইলি ছিলেন ভাইসরয় কাউন্সিলের হোম মেম্বার।'

পুরনো দিনের স্মৃতির নেশায় বেহুঁস হয়ে তারাপ্রসন্ন ঠিক বুঝতে পারেন না স্যার ম্যালকমের গুরুত্ব বোঝার বয়স নাতির হয় নি। তবু অনেক কথাই বলেন। যেন না বলে পারেন না।

'সি. আর. দাশ আর মতিলাল নেহরুর স্বরাজ্য পার্টিওয়ালারা সেন্ট্রাল অ্যাসেম্বলীতে ঢুকেই ডিমাণ্ড করল ইণ্ডিয়াকে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দিতে হবে। মতিলাল ঝড় বইয়ে দিলেন সেন্ট্রাল অ্যাসেম্বলীতে।......'

অম্বর অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে দাদুর মুখের দিকে।

'তারপর স্যার ম্যালকমের সঙ্গে মতিলালের কি ভীষণ তর্ক বাপরে বাপ!'

অম্বর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি ওদের তর্ক শুনেছিলে?'

তারাপ্রসন্ন হেসে জবাব দিলেন, 'শুনেছিলাম! আমি তো তখন হোম ডিপার্টমেন্টেই ছিলাম। সেন্ট্রাল অ্যাসেম্বলীর সেসন থাকলে রোজই যেতে হতো।'

তারপর একদিন শুধু স্যার ম্যালকম হেইলিই নয়, লর্ড রিডিংও চলে গেলেন। এলেন লর্ড আরউইন। নতুন বড়লাট। ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিয়েই বুঝলেন কিছু একটা করা দরকার। নয়তো এত বড় দেশকে সামলানো যাবে না। ইতিমধ্যে দেশীয় রাজ্যের নৃপতিদের মনেও নানারকম সন্দেহ জমতে শুরু করেছে। ওরা দাবি করলেন হিজ ম্যাজেস্টিস কিং এম্পারার অব ইণ্ডিয়ার সঙ্গে দেশীয় রাজ্যগুলির সম্পর্ক ঠিক করার জন্য নিরপেক্ষ তদন্ত দরকার। উনিশ শ' উনিশের ভারত আইনের ভবিষ্যৎ ভেবেচিন্তে দেখার জন্য নিযুক্ত হলো সাইমন কমিশন আর দেশীয় রাজ্যগুলির ব্যাপারে স্যার হাইকোর্ট বাটলার কমিটি নিয়োগ করা হলো। হোম ডিপার্টমেণ্ট থেকে আরো অনেকের সঙ্গে মিঃ টারা প্রসোননো সরকারকেও পাঠানো হলো বাটলার কমিটির কাজের জন্য। তারাপ্রসন্ন আর হোম ডিপার্টমেণ্টে ফিরলেন না। চলে গেলেন দেশীয় রাজ্যগুলোর কণ্ট্রোল-রুম পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট। মোড় ঘুরে গেল তারাপ্রসন্নর জীবনে।

রায় সাহেব লর্ড উইলিংডনের আমলে আণ্ডার সেক্রেটারী হতে পারেন নি বলে ওকে দেখতে পারতেন না কিন্তু লিনলিথগো'র আমলে আণ্ডার সেক্রেটারী হয়ে রায় সাহেব উপাধি পাওয়ায় আমৃত্যু তাঁর অন্ধ ভক্ত ছিলেন। সুযোগ পেলেই সবাইকে বলতেন, লোকটা মানুষ চিনতো, জানতো কাকে দিয়ে কাজ হবে। দাদুকে দিয়ে হিজ ম্যাজেস্টিস গভর্নমেণ্টের কি কাজ হয়েছিল তা অম্বর জানে না কিন্তু জানে দেওয়ান গিরিধারী লালজীর সঙ্গে দাদুর ঐ রকম নিবিড় বন্ধুত্ব না থাকলে উনি ওকে সুজন সিং পার্কের ফ্ল্যাট ছেড়ে দিতেন না।

ফ্ল্যাট পুরনো হলেও অম্বর মেরামত করিয়ে নিয়েছে নিজের খরচে। প্রায় সব ভাড়াটেরাই করিয়ে নেন। ভাড়া এত কম যে কেউ কিছু মনে করেন না। মেরামত করাবার পর সমস্ত ফ্ল্যাটটা চমৎকার হয়েছে। শুধু বাথরুমটা এখনও স্যাঁতসেঁতে। প্রথম কথা একেবারেই রোদ্দুর আসে না। তাছাড়া এই বাথরুমের পাশেই পিছন দিকের ফ্ল্যাটের বাথরুম। ঐ বাথরুমের পাইপটা বোধহয় খারাপ। জল লিক করে।

তাই অম্বরদের বাথরুমটা এখনও স্যাঁতসেঁতে। তা হোক। ওদের কোনো অসুবিধা হয় না। দু'জন মানুষের পক্ষে এত বড় ফ্ল্যাট যথেষ্ট। বরং প্রয়োজনের অতিরিক্ত। কুন্দন সিং খান মার্কেটে থাকে, সরকারী চাকরি করে, শুধু সকাল সন্ধ্যায় এদের রান্না বা টুকিটাকি বাজার-হাট করে দেয়। সারাদিনের জন্যে লোক রাখার প্রয়োজন হয় না। মতও নেই। মিঠু সারাদিন একলা থাকে। সুতরাং ফ্ল্যাটের মধ্যে একটা চাকর রাখা ঠিক নয়। চাকর-বাকর নিয়ে এই সুজন সিং পার্কের অনেক ফ্ল্যাটেই অনেক ঘটনা ঘটেছে। মাঝে মাঝেই ঘটে। দেওয়ান গিরিধারী লালজী নিজেও অম্বরকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, বি কেয়ারফুল অফ সারভেন্টস। পরে এখানে আসার পর এর-ওর কাছে চাকর বাকরদের সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছে। মিঠু অবশ্য বলে, 'ফাঁকা ফ্ল্যাট পেয়ে তোমার বেশ সুবিধে হয়েছে।'

'কেন?'

'ফাঁকা বলেই তো তুমি যা ইচ্ছে করতে পার।'

কথাটা মিথ্যে নয়। ঝি-চাকর থাকলেও অনেকটা সংযত থাকতে হতো। তাছাড়া ফ্ল্যাটগুলো এত বড় ও এমনভাবে তৈরী যে এক ফ্ল্যাটে একজন খুন হয়ে গেলেও পাশের ফ্ল্যাটের লোকজন জানতে পারবে না। বারান্দায় বসলে আলাদা কথা। অন্য ফ্ল্যাটের লোকজন দেখা যায়, কথাবার্তাও বলা যায়। অবশ্য ওরা কথা বলে শুধু যোশীদের সঙ্গেই। দুটো বারান্দা প্রায় মুখোমুখি। তাছাড়া মিঠুর মতো মিসেস যোশীও সারা দিন একলা থাকেন। সামনা সামনি বারান্দায় বসে-দাঁড়িয়ে দুজনেই গল্প করে। আলাপ হৃদ্যতায় পরিণত হয়েছে। তার কারণ মিঃ যোশী সিভিল ইঞ্জিনীয়ার আর অম্বর আর্কিটেক্ট। আগে সরকারি চাকরি করতেন। এখন একটা প্রাইভেট কনস্ট্রাকশন ফার্মে কাজ করেন। বুড়ো-বুড়ী ছাড়া একটি মাত্র ছেলে। চণ্ডীগড় মেডিক্যাল কলেজে পড়ে।

বারান্দায় বসে ব্রেকফাস্ট করতে করতে অম্বর জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার, যোশীজীদের দেখছি না যে।'

মিঠু অবাক হয়ে বললো, 'তুমি কি বলতো।'

'কেন? কি করলাম?'

'কাল রাত্রে এখানে বসে কফি খেতে খেতে তুমি ওদের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলে না?'

'করেছিলাম নাকি?'

'তাও মনে নেই?'

'মনে পড়ছে না তো।'

'তোমার কিচ্ছু মনে থাকে না। কালই তো বললাম ওরা চণ্ডীগড় গিয়েছেন।'

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে অম্বর বলে, 'ছোটখাট ব্যাপার ভুলে গেলে তো কোনো ক্ষতি নেই।'

'ক্ষতি নেই কিন্তু বোকা সাজতে হয়।'

'রায় সাহেব তারাপ্রসন্ন সরকারের নাতি অম্বর সরকার বোকা? তোমার কি মাথা খারাপ হলো মিঠু?'

মাথা দোলাতে দোলাতে ঠোঁটের কোনায় একটু হাসির রেখা ফুটিয়ে মিঠু জিজ্ঞাসা করল, 'বোকা সাজতে হয় না?'

'আমি বোকা হলে তুমি আমাকে বিয়ে করতে?'

'বিয়ে করার আগে তো ঘর করি নি।'

'ঘর কর নি ঠিকই কিন্তু মেলামেশা তো করেছ?'

'তখন তুমি খুব অ্যালার্ট থাকতে।'

'তার মানে?'

'আমাকে খুশী করার জন্যে, আমাকে জয় করার জন্যে যথেষ্ট সচেতন থাকতে।'

'তুমি আমাকে খুশী করার চেষ্টা করতে না?'

'বিন্দুমাত্রও না।'

'দেখ মিঠু, চুম্বক যেমন লোহাকে কাছে টানে, লোহাও তেমনি চুম্বকের কাছে আসতে চায়।'

আর তর্ক না করে মিঠু বলে, 'যাই হোক ভুলে যাবার জন্য তোমাকে বোকা হতে হয় না?'

অম্বর শুধু মাথা নাড়ল।

'যোশীজীর ছেলে বীরেনকে চিনতে না পারার জন্যে……'

অম্বর আর এগুতে দেয় না মিঠুকে, 'ওর সঙ্গে আমার কতটুকুই বা আলাপ যে…'

হঠাৎ কলিং বেল বাজল।

মিঠু একটু উঁচু গলায় বললো, 'কুন্দন সিং।'

বারান্দায় বসে বসেই ওরা কুন্দন সিং-এর দরজা খোলার শব্দ শুনল, চাপা গলায় কার যেন কথা ভেসে এলো। একটু পরেই বিশু আর চন্দনা বারান্দায় হাজির। কেউ কিছু বলবার আগেই চন্দনা হাসতে হাসতে বললো, 'এই এত বেলায় ব্রেকফাস্ট হচ্ছে?'

মিঠু বা অম্বরকে কিছু বলতে না দিয়েই বিশু বললো, 'সবাই কি আমার মতো সন্ন্যাসী যে ভোর ছ'টায় ঘুম থেকে উঠবে?'

'কে বললো তুমি সন্ন্যাসী নও? তোমার সন্ন্যাস.ধর্ম বা ব্রহ্মচর্য কি আমি অস্বীকার করতে পারি?' হাসতে হাসতে চন্দনা বললো।

এতক্ষণে অম্বর কথা বলার সুযোগ পেল, 'সপ্তাহে এই একটা দিনই তো মিঠুকে কাছে পাই।'

দুটো পিপিং চেয়ার টেনে বিশু আর চন্দনা বসতেই মিঠু চন্দনার দিকে তাকিয়ে বললো, 'কি ব্যাপার বলতো? হঠাৎ দুই বন্ধুতে যোগী-পুরুষ হবার কম্পিটিশন লাগালো কেন?'

'আমরা ছাড়া কে ওদের মাহাত্ম্য বুঝবে বল?'

অম্বর তাড়াতাড়ি নিজেকে দোষমুক্ত করার জন্য বললো, 'আচ্ছা চন্দনা, রবিবার ছাড়া কবে এমন করে মিঠুর সঙ্গে গল্প করার সুযোগ পাই বল?'

চন্দনা উত্তর দেবার আগেই মিঠু বললো, 'সপ্তাহের অন্য ছ'দিন তো আমাদের দেখাও হয় না, তাই না?'

বিশু আর সহ্য করতে পারল না, 'যাই বল মিঠু, অম্বরের মতো ডেডিকেটেড স্বামী পাওয়া দুর্লভ।'

কুন্দন সিং কফি দিয়ে গেল। চন্দনা কফি ঢালতে ঢালতে বললো, 'সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।'

কফির কাপে দুধ-চিনি নাড়তে নাড়তে মিঠু বললো, 'বাচ্চা ছেলের মত ওর আব্দারের ঠেলায় তো আমার প্রাণ বেরিয়ে যায়।'

সবাই মুখ টিপে হাসল।

ওদের তিনজনকে কফি দিয়ে নিজের কাপটা হাতে তুলে নিয়ে মিঠু বললো, 'ছোটবেলা থেকে দাদুর আদর খেয়ে এখন ও শুধু আদরই পেতে চায়।'

অম্বর হাসলেও মনে মনে একটু দুঃখ পেল, একটু আহত হলো।

রায়সাহেব তারাপ্রসন্ন সরকার হিজ ম্যাজেস্টিস গভর্নমেন্টের পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টের অসংখ্য জরুরী ও গোপনীয় কাজে প্রায়ই দেশীয় রাজ্যে যেতেন। রাজা-মহারাজা দেওয়ান-প্রাইম মিনিস্টারদের সঙ্গে দিনের পর দিন কাটাতে হতো। মদ্য পানও করতেই হতো। রাজা-মহারাজাদের গেস্ট হাউসে রাত কাটাবার সময় নৈশ-সঙ্গিনীও উপহার আসতো। নিয়মিত ও সর্বত্র। এটা শুধু নিয়ম নয়, অতিথি আপ্যায়নের অবশ্য কর্তব্য ছিল সেকালে। তখনকার দিনের সমস্ত কৃতি মানুষের মতো রায়সাহেবও বৈরাগ্যে বিশ্বাসী ছিলেন না ঠিকই কিন্তু পারিবারিক জীবন কলুষিত করাও অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। তবুও সংসারটা ভেঙে গেল। মুড়োগাছার মোক্তারের মেয়ে স্বামীর মদ্যপান কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারলেন না বলে একদিন শিশুপুত্রকে নিয়ে কেষ্টনগরে শ্বশুরের ভিটেয় চলে গেলেন। রায়সাহেব তারাপ্রসন্ন সরকার পিছন ফিরে তাকাতে পছন্দ করতেন না বলতেন, ভগবান সামনের দিকে চোখ দিয়েছেন সামনের দিকে দেখার জন্য। ভগবান চোখ দুটিকে পিছনের দিকে দিলে পিছনের দিকেই দেখতাম। মাসের পয়লা মনিঅর্ডার পাঠালেও কেষ্টনগর যেতেন না তারাপ্রসন্ন। চিঠিপত্রের আদান-প্রদানও ছিল না। ছেলে বড় হলে ছেলেকে দিল্লী আনতে চেয়েছিলেন কিন্তু আসে নি। কয়েকবার বেড়াতে এসেছে মাত্র। সে ইতিহাস দীর্ঘ এবং ঘটনাবহুল। বহু ছোট-বড় ভাল-মন্দ কাহিনীতে ভরা। স্ত্রীর মতো সন্তানও তারা-

প্রসন্নকে ঘৃণা করত। তারাপ্রসন্ন স্বপ্ন দেখলেন ছেলে আই-সি-এস না হলেও বড় গেজেটেড অফিসার হবে। হলো মোক্তার। সেই মোক্তার ছেলের বিয়ের দিন তারাপ্রসন্ন হঠাৎ কেষ্টনগরের বাড়িতে হাজির হলেন। সাহেব ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট কুষ্টিয়া থেকে মোটরে এসে সে বিয়েতে নেমন্তন্ন খেলেন।

কর্মজীবনে সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনে একের পর এক আঘাত আর দুঃখ পেয়েছেন রায়সাহেব। প্রথমে সাত দিনের মধ্যে স্ত্রী আর পুত্র মারা গেলেন কলেরায়। চার বছর পর পুত্রবধূ। অম্বর যখন ওর দাদুর সঙ্গে দিল্লী এলো তখন ও মাত্র পাঁচ বছরের শিশু। জীবনে বাবার ভালবাসা, মায়ের স্নেহ না পেলেও অম্বর কোনো অভাব, কোনো শূন্যতা বোধ করেনি কোনোদিন। দাদুর কাছে সব কিছু পেয়েছে। দাদুর কাছে সারা জীবন ধরে আদর পেয়ে আজ যদি সে স্ত্রীর কাছেও একটু আদর-ভালবাসা চায়, তাতে অন্যায় কি? উপহাসই বা কেন সহ্য করতে হবে? তাছাড়া জীবনের সব অপূর্ণতা পূর্ণ করার জন্যই তো অনেক দ্বিধা আর সঙ্কোচ ত্যাগ করে সে মিঠুকে ভালবেসেছে, বিয়ে করেছে।

মুহূর্তের মধ্যে অম্বর আরো কত কি ভাবল। না ভেবে পারল না। মনে মনে বললো, আচ্ছা মিঠু, এই পৃথিবীতে তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে বলতে পার? এই পৃথিবীতে আর তো কেউ নেই যার কাছে আমি মনের শান্তি, প্রাণের তৃপ্তি পেতে পারি। তুমি ছাড়া আর কে আছে যার কাছে হেরে গিয়েও গর্ব হয়? আনন্দ হয়?

চন্দনা বললো, 'যাই বল ভাই, ঐটাই অম্বরদার স্পেশ্যালিটি। ঐ জন্যেই অম্বরদাকে সবাই ভালবাসে।'

'তোমার কাছ থেকে জোর করে ভাই-ফোঁটা আদায় করেছে বলে তুমি খুব মুগ্ধ তা আমি জানি।' হাসতে হাসতে মিঠু বললো।

কথাটা খুব মনে লেগেছে বিশুর, ঠিক বলেছে মিঠু। চন্দনার ধারণা অম্বরের মতো সহজ সরল মানুষ হয় না।

মিঠু হাসল। একবার অম্বরকে দেখল। তারপর ওদের দুজনকে।

'ব্যাস! আর না। আমার স্বামীকে নিয়ে নো মোর ডিসকাসন।'

চন্দনা মিঠুর গায়ে একটা ধাক্কা মেরে বিশুর দিকে তাকিয়ে বললো, 'দেখছ, অম্বরদাকে নিয়ে আমরা একটু কথা বলেছি বলে আর সহ্য করতে পারছে না।'

'তোমার মতো সবাই তো অষ্টপ্রহর স্বামীর নিন্দা করতে বা শুনতে অভ্যস্ত নয়।'

এবার চন্দনা রেগে গেল, 'এবার বলি কেন রাগ করেছিলাম।'

বিশু তাড়াতাড়ি চন্দনার কানের কাছে ফিসফিস করে বললো, 'এটা আমাদের হাসব্যাণ্ড-ওয়াইফের ব্যাপার। ওদের কাছে বলার কি দরকার?'

বিশুর কাণ্ড দেখে অম্বর সিগারেট টানতে টানতে হাসছিল, কিন্তু মিঠু হাজার হোক মেয়ে। কৌতূহল চাপতে পারল না। জিজ্ঞাসা করল 'কি ব্যাপার কি?'

'ইয়াং মেয়ে দেখলে এমন গলে পড়ে যে কি বলব।' অনুযোগ করল চন্দনা।

বিশু হাসতে হাসতে বলে, 'আরে বাপু লাটাই তো তোমার হাতে, ঘুড়ি কতদূর যাবে বল?'

হোহো করে হেসে উঠল মিঠু আর অম্বর।

ওদের হাসির আওয়াজ থামতেই বিশু হাঁক দিল, 'কুন্দন সিং!'

কুন্দন সিং আসতেই বিশু পার্স থেকে টাকা দিয়ে বললো, 'দো বোতল বিয়ার লে আও জলদি।'

একটু শাসন করার সুরে চন্দনা বললো, 'বিয়ার দিয়ে শুরু করছ, শেষ করবে কি দিয়ে?'

'ইফ ইউ প্লীজ বিয়ার মী, তাহলে নিশ্চয়ই হুইস্কী দিয়ে শেষ করব।'

চন্দনা একটু গম্ভীর হবার চেষ্টা করেও পারল না। তিনজনেই হাসল।

বিশু অত্যন্ত যুক্তিবাদীর মতো বিকল্প প্রস্তাব করল, 'ইফ ইউ কান্ট বিয়্যার দ্যাট, বিয়্যার এ চাইল্ড উইদাউট ডিলে।'

হাসিতে ফেটে পড়ল মিঠু আর অম্বর।

চন্দনা বললো, 'আমি জীবনে এমন অসভ্য লোক দেখি নি।'

দশ টাকার নোটটা হাতে নিয়ে কুন্দন সিং'কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই বিশু চীৎকার করে উঠল, 'যাও! জলদি লে-আও।'

দুই

শুধু ছুটির দিন নয়, বিশু আর চন্দনা প্রায়ই আসে। এরাও যায় ওদের বেঙ্গলী মার্কেটের বাসায়। হাসি-ঠাট্টা, গল্প-গুজব, খাওয়া-দাওয়া, বেড়ানো, সিনেমা দেখা হয় একসঙ্গে। আরো কত কি। বিশু আর অম্বর শুধু আশৈশবের বন্ধু নয়, তার চাইতেই আরো কিছু। অনেক কিছু। ছোটবেলা থেকে সুখে-দুঃখে ওরা বার বার কাছে এসেছে। ঘনিষ্ঠ হয়েছে। তার কারণ আছে, ইতিহাস আছে।

উনিশ শ' তিরিশ। হঠাৎ ভারতবর্ষের রাজনীতিতে কাল-বৈশাখীর মাতলামী শুরু হলো। পয়লা ফেব্রুয়ারী কিশোরগঞ্জ রামানন্দ ইউনিয়ন স্কুলের শিক্ষক সতীশ রায় বিপ্লবীদের ক্ষতি করার জন্য প্রাণ হারালেন। ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে অমৃতসরে খালসা কলেজের অধ্যক্ষকে লক্ষ্য করে বোমা পড়ল। একজন মারা গেলেন, আহত হলেন অনেক। মার্চে বিশেষ কিছু না ঘটলেও আঠারই এপ্রিল চট্টগ্রামের মাস্টারদা সারা ইংরেজ সাম্রাজ্যকে চমকে দিলেন। জালালাবাদ পাহাড় থেকে বারুদের গন্ধ হারিয়ে যাবার আগেই শিকলবাহা গ্রামে বিপ্লবীদের রাইফেল, রিভলবার গর্জে উঠল। পর পর আরো কত ঘটনা। হাওড়ার শিবপুর, রংপুরের গাইবান্ধা, ময়মনসিং থেকে কাশী, ঝান্সী, কানপুর, লুধিয়ানা, লায়ালপুর, ঝঙ্ক, অমৃতসর, লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডি। এসব ঘটনাকে ম্লান করে দিল পঁচিশে আগস্টের প্রায় অবিশ্বাস্য নাটক। দিনে-দুপুরে বৃটিশ রাজশক্তির প্রাণকেন্দ্র কলকাতার ডালহৌসী স্কোয়ারে কুখ্যাত চার্লস টেগার্টকে লক্ষ্য করে বোমা ফাটল। অনুজ সেন মারাত্মকভাবে আহত

হলেন ও পরে মারা যান। ডাঃ নারায়ণ রায়, ডাঃ ভুপাল বসু ও আরো কয়েকজন ধরা পড়লেন। ঠিক পরের দিনই জোড়াবাগান থানায় বোমা পড়ল। তারপর দিন ইডেন গার্ডেনের পুলিশ ফাঁড়িতে। উনত্রিশে দেশবন্ধু পার্কে রতন হাজরা মারা যান। ঐ দিনই ঢাকার মিটফোর্ট হাসপাতালে নারায়ণগঞ্জের জল পুলিশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অসুস্থ টিসাহেবকে দেখতে গিয়েছিলেন ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ প্রিজন লোম্যান। জেলের মধ্যে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর অকথ্য নির্যাতন করার জন্য লোম্যানের উপর বাংলার বিপ্লবীদের সতৃষ্ণ দৃষ্টি ছিল। সেদিন সুযোগ জুটে গেল। মেডিক্যাল স্কুলের ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র বিনয়কৃষ্ণ বসুর ছোট একটা পিস্তলের মাত্র তিনটি বুলেট। ল্যোমান লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। ওর পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন ঢাকা পুলিশের হডসন। হাজার হোক লোম্যানের মতো তো ভি-আই-পি নয়, তাই মাত্র দুটি বুলেট দিয়েই বিনয় ওকে পুরস্কৃত করল। একটু দূরেই দাঁড়িয়েছিল সরকারী ঠিকাদার মীরজাফর সত্যেন সেন। সে জড়িয়ে ধরল বিনয়কে। বুলেট ফুরিয়ে গেলেও দেহটা তো ছিল। মাত্র একটা ঘুষি। দালাল সত্যেন সেন ছিটকে পড়তেই বিনয় এক দৌড়ে স্কুল মাঠ পেরিয়ে মেডিক্যাল মেস। পায়খানার ছাদ টপকে আরমানীটোলা। ঘোড়ার গাড়ি আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল। সেই গাড়িতে বক্সীবাজারে বিপ্লবী মণি সেনের বাড়ি। ঐখানেই সুপতি রায়ের সঙ্গে বিনয়ের দেখা হলো।

তারপর?

তারপর কখনো চাষী, কখনো ভদ্দরলোক সেজে সুপতি আর বিনয় শত শত ইংরেজ গোয়েন্দাদের ফাঁকি দিয়ে একদিন কলকাতায় সাত নম্বর ওয়ালিউল্লা লেনের গ্যারেজে আশ্রয় নিল। এদিকে মেদিনীপুর জেল থেকে ছাড়া পেয়েই মেজর সত্য গুপ্ত এলগিন রোডে গিয়ে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা করলেন। রসময় শূর বিনয়ের সঙ্গে দেখা করে এলগিন রোডে সব কিছু জানাতেই সিদ্ধান্ত হলো রাইটার্স বিল্ডিং হানা দেওয়া হবে আর বিনয় বসু হবে তার নেতা। সব কিছু ঠিক হবার পর তিন মাসের জন্য বিনয়কে ধানবাদে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

তিন মাস পর।

আটই ডিসেম্বর। সকাল সাড়ে ন'টায় নিউ পার্ক স্ট্রীটের বাড়ি থেকে ট্যাক্সিতে রওনা হলো দীনেশ আর সুধীর (বাদল) গুপ্ত। পাইপ রোডের মোড়ে ট্যাক্সি থামার পরই অন্য একটা ট্যাক্সি চড়ে বিনয় আর রসময় হাজির। বিপ্লবী দলের জি-ও সি সুভাষচন্দ্রের আদেশের কথা মনে করিয়ে দিয়ে রসময় চলে গেল আর ওরা তিনজন পাকা সাহেব সেজে চলে গেল রাইটার্স বিল্ডিং। তখন বেলা সাড়ে বারোটা। দোতলার বারান্দায় সার্জেণ্ট ফোর্ড তো ওদের বড় অফিসার ভেবে স্যালুটই করল। ঢুকল নতুন ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ প্রিজন কর্নেল সিমসনের ঘরে। একসঙ্গে তিনটি রিভলবার গর্জে উঠল। সিমসনের পার্সোন্যাল অ্যাসিসট্যাণ্ট রায় বাহাদুর জ্ঞান গুহ ভয়ে আতঙ্কে বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে লাগলেন। রায় বাহাদুরের জন্য বুলেট নষ্ট না করে ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। এরপর জুডিসিয়্যাল সেক্রেটারী টুইনহাম, তারপর হোম সেক্রেটারী আলবিয়ান। পাদ্রী জনসন জলের পাইপ বেয়ে নিচে নেমে প্রাণ বাঁচালেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই লালবাজার থেকে টেগার্ট দলবল নিয়ে পৌঁছে গেলেন রাইটার্স বিল্ডিং। ওদের বুলেট ফুরিয়ে এলেও পটাসিয়াম সায়নাইড পকেটেই ছিল। সুধীর (বাদল) সায়নাইডের প্যাকেট মুখে পুরে দিতেই ঢলে পড়ল। বিনয় সায়নাইড খেয়েও ঠিক নিশ্চিন্ত হতে পারল না। একবার বন্দে মাতরম্ চীৎকার করে নিজের কানের কাছে রিভলবার চেপে ট্রিগার টিপল। ভেরই মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ওর মৃত্যু হলো। পরের দিন খবরের কাগজে হেডিং হলো, বিনয় ইজ ডেড—লং লিভ বিনয়। বেঁচে রইল শুধু দীনেশ। আলিপুরের জজ গার্লিকের বিচারে তাঁর ফাঁসী হলো। আর ঐ জজ সাহেবের বিচার করল কানাই ভট্টাচার্য। একেবারে এজলাসের মধ্যে গুলী করে শেষ করে দিল কিন্তু কানাই এর বিচার করার সুযোগ কারুর হলো না। পটাসিয়াম সায়নাইড খেয়ে সে হাসতে হাসতে পালিয়ে গেল।

'সাহেবদের খুশী করার জন্য সোমেশ্বর স্বদেশী ছেলেগুলোর উপর

বড্ড বেশী অত্যাচার করছিল। সোমেশ্বরকে মারার জন্য একবার বোমাও মেরেছিল। বেঁচে যায় কিন্তু ডান পা'র বেশ খানিকটা জায়গা পুড়ে যায় .....'

দাদুর কথা শুনতে শুনতে অবাক হয়ে অম্বর প্রশ্ন করে, 'তাই নাকি ?'

'ঐ ঘটনার কিছু দিনের মধ্যেই সোমেশ্বর দিল্লী বদলী হলো। তার অবশ্য অনেক কারণ ছিল। প্রথমতঃ স্বদেশীদের হাত থেকে ওকে বাঁচানো। তাছাড়া তখন যোগেশ চ্যাটার্জী, ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদের দলে বহু বাঙালীর ছেলে নর্থ ইণ্ডিয়ার নানা শহরে ছড়িয়েছিল। ঐসব ছেলেদের উপর নজর রাখার জন্য তখন অনেক বাঙালী আই-বি অফিসারকে বাংলা থেকে দিল্লী আনা হয়।'

অম্বর দাদুর কাছে সব কিছু শুনেছে। শুনেছে কিভাবে সোমেশ্বরবাবু স্বদেশী ছেলেদের ধরিয়ে দিতেন, অত্যাচার করতেন ও রায় বাহাদুর হলেন। রায় বাহাদুর সোমেশ্বর চ্যাটার্জীর ছেলে আশুতোষও সরকারী চাকরিতে ঢুকল। তবে পুলিশে নয়, হোম ডিপার্টমেণ্টে। তাও আবার তারাপ্রসন্ন সরকারের অধীনে। এই চাকরি পাবার পরই আশুতোষের বিয়ে হলো।

'আশুর বৌ' এর কথা তোর মনে আছে দাদু ?'

'আমাকে খুব আদর করতেন, তাই না দাদু ?'

'হ্যাঁ, তোকে খুব ভালবাসত। ঐ মেয়েটার ভরসাতেই তো আমি তোকে কেষ্টনগর থেকে নিয়ে এলাম।'

স্ত্রী আর পুত্র মারা যাবার পর তারাপ্রসন্ন প্রায়ই কেষ্টনগর যেতেন পুত্রবধূ আর অম্বরকে দেখতে। রায় বাহাদুর সোমেশ্বর চ্যাটার্জী পাশের কোয়ার্টারেই থাকেন। অম্বরের দাদুকে ওরা সবাই যথেষ্ট সম্মান ও খাতির করতেন। দুই বাড়ির মধ্যে হৃদ্যতাও ছিল বেশ। দিল্লীর বাইরে যাবার সময় তারাপ্রসন্ন ওর শোবার ঘরের চাবি আশুতোষের স্ত্রীর কাছে রেখে যেতেন। কেষ্টনগর যাবার কথা শুনলেই আশুতোষের স্ত্রী বলতেন, 'জ্যেঠু, এবার অম্বরদের আনবেন তো ?'

একটু ম্লান হাসি হেসে তারাপ্রসন্ন বলতেন, 'আমি যে মদ খাই বৌমা। আমার কাছে কি বিধবা পুত্রবধূ থাকতে পারে?'

'কি বলছেন আপনি?'

'ঠিক কথাই বলেছি বৌমা। এই একটু মদ খাই বলেই তো সবাই আমাকে ছেড়ে চলে গেল।' চাবিটা আশুতোষের স্ত্রীর হাতে দিতে দিতে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তারাপ্রসন্ন বললেন, 'মনে হয় ছেলের মতো পুত্রবধূও আমাকে ঘেন্না করেন। তাই তো আমার কথা বলতে সাহস হয় না। দূর থেকেই কর্তব্য করে যাচ্ছি।'

কথাগুলো বলতে বলতে তারাপ্রসন্নর চোখের কোনায় জল এসে যেতো। আর কোনো কথা বলতে পারতেন না।

'না, না, জ্যেঠু, তা হতে পারে না। আপনাকে কি কেউ ঘেন্না করতে পারে?'

আশুতোষের স্ত্রী সত্যি ভাবতে পারতেন না এমন মানুষকে কেউ ঘেন্না করতে পারে। তারাপ্রসন্ন সরকার সন্ধ্যার পর মদ খান, রাজাদের গেস্ট হাউসে গিয়ে ফুর্তি করেন—এসব কথা ওরা জানতেন। তবু চ্যাটার্জী পরিবারের সবাই ওঁকে ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন। রায়বাহাদুরের স্ত্রী ঘোমটা দিয়ে দূরে দূরে থাকতেন, আশুতোষ অফিসার বলে রায় সাহেবকে একটু ভয়ই করতেন। তাই খাতিরটা বেশী ছিল রায়বাহাদুর আর ওঁর পুত্রবধূর সঙ্গে। রায়বাহাদুরকে প্রায়ই দিল্লীর বাইরে যেতে হতো বলে আশুতোষের স্ত্রীর সঙ্গে গল্পগুজব করেই রায়সাহেবের সময় কাটত।

তারাপ্রসন্ন সংসার দেখাশুনার জন্য চাকর থাকলেও আশুতোষের স্ত্রী নিজের সংসারের কাজকর্ম সেরে নিয়মিত তদ্বির-তদারক করতেন। দুবেলা, প্রতিদিন। তারাপ্রসন্ন একদিন হাসতে হাসতে ওকে বলেছিলেন, 'তুমি যদি আমার পুত্রবধূ হতে তাহলে বোধহয় সত্যি মদ খাওয়া ছাড়তে পারতাম।'

'না, না জ্যেঠু মদ খাওয়া ছাড়বেন না।'

'তুমি একি কথা বলছ?'

'একটু-আধটু মদ না খেলে মানুষ বোধহয় উদার হতে পারে না।'

তারাপ্রসন্ন হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে বললো তোমাকে ?'

'কে আবার বলবে ? শরৎবাবুর বইগুলো পড়লেই বোঝা যায়।'

পরের বার কলকাতা গিয়ে তারাপ্রসন্ন গুরুদাস চ্যাটার্জীর দোকান থেকে শরৎবাবুর বইগুলো কিনে এনে আশুতোষের স্ত্রীকে দিয়েছিলেন।

বুড়ো বয়সে, চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর মানুষ বোধহয় একটু বেশী কথা বলতে পছন্দ করে। তাছাড়া এই একটি নাতি ছাড়া তারাপ্রসন্নর তো আর কোনো আপনজন, প্রিয়পাত্র ছিল না। তাই তাঁর দীর্ঘজীবনের সব কথাই অম্বরকে বলতেন। 'আমি মদ খেতাম ও আমার স্ত্রী-পুত্র আমার কাছে থাকত না, এ খবর দিল্লীর বাঙালী সমাজের অজানা ছিল না। বেয়ার্ড রোড—গোল মার্কেটের বাঙালীদের আড্ডাখানায় আমাকে নিয়ে অনেকরকম সরেস আলোচনাও হতো কিন্তু হঠাৎ একদিন আশু'র বৌ আমাকে চমকে দিল—

'একটা খবর শুনছেন জ্যেঠু।'

'কি খবর বৌমা ?'

'আমি আপনার কাছে আসি বলে কিছু শোনেন নি ?'

'কই না তো।'

আশুতোষের স্ত্রী একটু হাসল। 'দেখছি শরৎবাবু ইচ্ছে করলে দিল্লী নিয়েও পল্লীসমাজ লিখতে পারতেন।'

তারাপ্রসন্ন ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হঠাৎ একথা বলছ কেন ?'

'আমি আপনার কাছে আসি বলে একদল বাঙালী যা-তা বলে বেড়াচ্ছে।'

আশুতোষের স্ত্রী অত্যন্ত নির্বিকারভাবে কথাটা বললেও তারাপ্রসন্ন লজ্জিত না হয়ে পারলেন না। হাতের খবরের কাগজটা পাশে রেখে মাথা নিচু করে ইজিচেয়ারে বসে রইলেন। চুপচাপ, অনেকক্ষণ।

'একি জ্যেঠু। আপনি কথা বলছেন না কেন ?' আগের মতোই সহজ সরলভাবে আশুতোষের স্ত্রী প্রশ্ন করল।

আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে তারাপ্রসন্ন কি যেন ভাবলেন।

তারপর মুখ না তুলেই বললেন, 'জানি অনেকেই আমার নিন্দা করে। তুমি বরং আর এসো না।'

আশুতোষের স্ত্রী একটু জোরেই হাসল, 'আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে জ্যেঠু! কিছু লোক আজে-বাজে কথা বলছে বলে আমি আসব না কেন?'

আগের মতোই মুখ নিচু করে তারাপ্রসন্ন বললেন, 'হাজার হোক তুমি রায় বাহাদুরের পুত্রবধূ। তাছাড়া তোমার মতো একটা মেয়েকে নিয়ে এই নোংরা আলোচনা হোক, তা তো আমি চাইব না' এবার একটা চাপা দীর্ঘনিঃশাস ছেড়ে রায়সাহেব বললেন, 'দিল্লীর বাঙালী সমাজে তো আমার বিশেষ সুনাম নেই, সুতরাং তোমার না আসাই ভাল।'

'আমি কি ওদের খাই না পরি যে ওদের এত ভয় করব?'

'কিন্তু বৌমা, তোমার তো শ্বশুর-শাশুড়ী-স্বামী আছে...'

'তারা তো আমাকে কিছু বলেন নি।'

'তবুও তাদের কানে যদি এইসব গুজব পৌঁছায় তাহলে কি লজ্জার কথা...'

তারাপ্রসন্নকে কথাটা শেষ করতে দিল না আশুতোষের স্ত্রী, 'সে আমি বুঝব জ্যেঠু। আপনি এইসব আজে-বাজে ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।'

রায় সাহেব তারাপ্রসন্ন সরকার রোজ ডায়েরী লিখতেন। অম্বর জানত কিন্তু দাদুর জীবিতকালে সে পড়ে নি। দাদুর মৃত্যুর পর পড়েছে।...আশুর স্ত্রীকে দেখতে সত্যিই সুন্দরী। সরোজ নলিনী স্কুলে লেখাপড়া শিখেছে। মেয়েটির অনেক গুণ। সব চাইতে বড় গুণ মনের মধ্যে কোনো মালিন্য নেই আর খুলে হাসতে পারে। ঠিক ঝর্ণার ধারার মতো ওর হাসি। কোনো প্রচেষ্টা নেই, আপন বেগে সে হাসি ওর অন্তর থেকে বেরিয়ে আসে। শূন্য পরিত্যক্ত মন্দির থেকে হঠাৎ পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের আওয়াজ ভেসে এলে মানুষ যেমন বিস্ময়ের সঙ্গে আনন্দিত হয়, আমার কোয়ার্টারে আশুর স্ত্রীর প্রাণখোলা

হাসি শুনে আমিও ঠিক সেই রকম আনন্দ অনুভব করেছিলাম। এখন প্রায় নেশার মতো হয়ে গেছে। রোজ কিছুক্ষণ বৌমার সঙ্গে গল্পগুজব না করলে ভাল লাগে না। রায় বাহাদুরের স্ত্রী আমার সঙ্গে কথা বলেন না অথচ আমি জানি আমার সম্পর্কে ওর উৎকণ্ঠার শেষ নেই। রোজ আমার জন্য কিছু না কিছু রান্নাবান্না বৌমার হাত দিয়ে পাঠাবেনই। আমি রায় বাহাদুরের কাছে পর্যন্ত নালিশ করেছি। ফল হয় নি। রায় বাহাদুর হাসতে হাসতে জবাব দিয়েছেন, আরে মশাই, পুলিশের চাকরি করি বলে কি ভদ্দরলোক না? তাছাড়া আপনার বৌঠানের ধারণা চাকর-বাকরের রান্না খেয়ে ঠিক পেট ভরে না। সুতরাং আমি বারণ করলেও উনি শুনবেন না।...

ডায়েরীতে পাতার পর পাতা লিখছেন তারাপ্রসন্ন।

...প্রথম প্রথম শুধু রান্না পৌঁছে দিতেন বৌমা। আস্তে আস্তে আমার ঘর সংসারের তদারকী শুরু করলেন।...

'আপনি তো আচ্ছা লোক জ্যেঠু।'

'কেন বৌমা? কি করলাম?'

'আপনার বিছানায় কটা চাদর পাতা আছে জানেন?'

'নোংরা বিছানায় আমি শুতে পারি না বলে কাল রাত্রে শুতে যাবার সময় ময়লা চাদরটা না পালটিয়েই ধোপাবাড়ির একটা চাদর পেতেছি।'

আশুতোষের স্ত্রী হাসেন। বলেন, 'তাহলে তো দুটো চাদর থাকত।'

'তবে কটা আছে?'

'তিনটে।'

'তাহলে বোধহয় এর আগের বারেও ময়লা চাদরের উপরেই কাচানো চাদর পেতেছি।'

'বোধহয় নয়, নিশ্চয়ই।'

এর পর থেকে প্রত্যেক রবিবার সকালে এসে বিছানার চাদর পালটে দিতেন বৌমা। কবে কি রান্না করতে হবে, তাও উনি চাকরবাকরকে বলে দিতেন। কোনো কোনোদিন বৌঠান নিজেও চাকরটাকে ডেকে বলে দিতেন। বেশ লাগত। সংসার না করেও সংসারের আনন্দ

উপভোগ করছিলাম। আস্তে আস্তে বৌমা আমার সংসারের সমস্ত দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে নিলেন। এখন সত্যি যদি বৌমা আমার সংসারের দেখাশুনা না করেন তাহলে আমি বিপদে পড়ব কিন্তু অমন সুন্দর একটা মেয়েকে নিয়ে আজেবাজে কথাবার্তা হোক, তা আমি চাই না।···

অম্বরের যখন এক বছর বয়স তখন বিশুর জন্ম হলো। নাতি হওয়ায় রায় বাহাদুর আর তাঁর স্ত্রী সারা বেয়ার্ড রোডের সব কোয়ার্টারে মিষ্টি পাঠালেন, বেয়ার্ড রোড কালী মন্দিরে ঘটা করে পূজা দিলেন। আর রায় সাহেব? বৌঠানকে একটা গরদের শাড়ী আর বৌমাকে একটা বেনারসী দিয়ে বললেন, 'আমার ছোট নাতিকে যদি অন্তত একবার করে আমার বিছানায় হিসি করতে না দেন, তাহলে কিন্তু প্রেজেনটেশন ফেরত নিয়ে নেব।'

রায় বাহাদুর চুরুট টানতে টানতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর দাদুকে যদি আপনার বিছানায় হাগু করতে দিই তাহলে কি আমাকে একটা স্যুট দেবেন?'

এসব আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হলো না। আশুতোষ হঠাৎ মারা গেলেন। এর বছর খানেকের মধ্যে রায় বাহাদুরও রিটায়ার করলেন।

'ওর কথা কি তোর মনে আছে দাদু?'

'না।'

'তোকে দিল্লী আনার কয়েক মাস পরেই রায় বাহাদুর মারা যান।'

'ওর কি হয়েছিল দাদু?' অম্বর জানতে চায়।

'মারা গেলেন হার্টফেল করে কিন্তু আসলে আশুর মৃত্যুর পর থেকেই কেমন হয়ে যান···'

'তার মানে?'

রায় সাহেব একটু ম্লান হাসি হাসলেন। একটু উদাস দৃষ্টিতে দূরে কি যেন দেখলেন। 'আশু মারা যাবার পর রায় বাহাদুর রাতারাতি একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেলন। কোনমতে অফিস করে এসেই তোকে আর বিশুকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। কারুর সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা পর্যন্ত

বলতেন না। কয়েক মাস এমনি কাটল। তারপর একদিন রাত্রিবেলায় হঠাৎ আমার কোয়ার্টারে এলেন—'

'রায় সাহেব। ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি?'

এত রাত্রে রায় বাহাদুর? তারাপ্রসন্ন প্রথমে ঠিক বিশ্বাস করতে পারেন নি। ভাবলেন বোধহয় ভুল শুনেছেন।

'রায় সাহেব। ঘুমুলেন?'

তারাপ্রসন্ন এবার তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে বললেন, 'আসুন, আসুন।'

'কিছুতেই ঘুম আসছিল না। তাই ভাবলাম আপনার কাছে এসে একটু হুইস্কী খেয়ে যাই।'

তারাপ্রসন্ন যেন গাছ থেকে পড়লেন। রায়বাহাদুর সোমেশ্বর চ্যাটার্জী হুইস্কী খাবেন? 'আরে আসুন, আসুন। আপনার মতো সাধু প্রকৃতির লোক আবার হুইস্কী খাবে!'

রায় বাহাদুর একটু অদ্ভুতভাবে হেসে উঠে বললেন, 'কি বললেন রায় সাহেব? আমি সাধু? জানেন আমার জন্য কতগুলো ছেলে ফাঁসিকাঠে ঝুলেছে? রিভলবারের গুলিতে মরেছে?'

তারাপ্রসন্ন সব কিছু না জানলেও অনেক কিছু জানতেন, কিছু কিছু অনুমান করতেন। কিছু স্বদেশী ছেলের সর্বনাশ না করলে যে এমন লাফিয়ে লাফিয়ে প্রমোশন বা রায় বাহাদুর খেতাব পাওয়া যায় না, তা উনি জানতেন। তবুও বললেন, 'ওসব আজেবাজে কথা ছাড়ুন তো। আসুন, ভিতরে আসুন।'

রায় বাহাদুর একটা চেয়ারে বসেই বললেন, আজেবাজে কথা? আমি মোটেও আজেবাজে কথা বলি নি। টেগার্ট সাহেবকে খুশী করার জন্য, চাকরিতে প্রমোশন পাবার লোভে নেকড়ে বাঘের মতো স্বদেশী ছেলেগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তাম। মোটা বুটের লাথি মারতে মারতে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছি। এমন জোরে পেটে লাথি মারতাম যে ছেলেগুলো পায়খানা করে দিত, দিনের পর দিন রক্তবমি করত।'

'ওসব কথা এখন ভেবে কি হবে?'

'আশু মারা যাবার পর থেকে শুধু ঐ কথাই তো ভাবছি। আর কিছু ভাবতে পারি না।'

'না, না, ওসব কথা ভাববেন না।'

প্রায় পাগলের মতো রায় বাহাদুর হাসলেন, 'ভাববেন না বললেই কি ভাবনা দূর হয়?'

রায় বাহাদুর নিজেই নিজের প্রশ্নর উত্তর দিলেন, 'হয় না রায় সাহেব, হয় না। যাদের আমি অত্যাচার করেছি তারা সবাই রোজ রাত্রে আমার কাছে আসে…।'

'আঃ। কি যা তা বলছেন রায় বাহাদুর?'

'বিশ্বাস করুন রায় সাহেব, আপনার কাছে আমি মিথ্যা কথা বলছি না। কারুর কাছে এসব কথা বলতে পারি না। নিজের স্ত্রী-পুত্র বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী—কারুর কাছে এসব কথা বলতে পারি নি…'

'আমার কাছেই বা বলছেন কেন?'

'না বলে থাকতে পারছি না। এতদিনের এত অপকর্মের কথা কাউকে না বলে আমি প্রায় পাগল হয়ে উঠেছি…'

তারাপ্রসন্ন বললেন, 'বৌঠানকে বললেই পারতেন।'

'আপনি পাগল হয়েছেন রায় সাহেব? আপনার বৌঠান আমার এইসব কীর্তি জানলে আমাকে নিয়ে ঘর করতেন? নাকি ভালবাসতেন? নাকি আমাকে ভাল-মন্দ খাওয়াবার জন্য সারা দিন রান্না ঘরে কাটাতেন?'

সেই পাগলের মতো আবার একবার বিচিত্র হাসি হাসলেন রায় বাহাদুর। তারপর বললেন, 'এই পৃথিবীতে কোন মানুষ কি কোন একজনের কাছে সব কথা বলতে পারে? কারুর কাছেই জীবনের সব কথা বলা যায় না রায় সাহেব।'

কথাটা শুনেই রায় সাহেব চমকে উঠলেন। সত্যিই তো সব কথা কাউকে বলা যায় না। রায় বাহাদুর তো ঠিকই বলছেন। তাহলে তো ওর মাথা খারাপ হয় নি। তারাপ্রসন্ন ক্ষণিক মুহূর্তের মধ্যেই নিজের জীবনের সমস্ত অতীতটাকে দেখে নিলেন। মনে পড়ল আরতির কথা।

আরতি।

সবাই জানে তারাপ্রসন্ন সরকার মদ খায়। হয়তো জানে রাজা-মহারাজাদের প্যালেসে গিয়ে বাইজীর নাচ দেখে। রাতে স্ফূর্তি করে কিন্তু কেউ জানে না আরতির কথা। এমন কি বরদাকান্ত সর্বাধিকারীও জানতেন না।

এসব ঘটনা আজকাল তারাপ্রসন্ন মনে পড়ে না। রায় বাহাদুর সোমেশ্বর চ্যাটার্জির কথা শুনে আজ সব কিছু মনে পড়ল। খুঁটিনাটি সব কিছু স্পষ্ট মনে পড়ল।

একদল বাঙালী তীর্থযাত্রীর সঙ্গে মাসী হরিদ্বার থেকে কলকাতা চলে গেলেন আর তারাপ্রসন্ন বরদাকান্ত সর্বাধিকারীর সঙ্গে দিল্লী এলেন। বরদাকান্ত একা তীর্থে যান নি, গিয়েছিলেন স্ত্রী আর বিধবা আরতিকে নিয়ে। হরিদ্বার থেকে ট্রেনে আসার সময় বরদাকান্ত নিজের জীবনের দুঃখের কাহিনী শোনাচ্ছিলেন তারাপ্রসন্নকে, পর পর তিনটি সন্তান নষ্ট হবার পর এই মেয়ের জন্ম হলো। দশটা নয়, পাঁচটা নয়, এই একটি সন্তানকে নিয়েই বেশ ছিলাম, কিন্তু পূর্ব জন্মের কর্মফলের জন্য এই মেয়েটাকে নিয়েও সুখী হতে পারলাম না। বিয়ের এক বছরের মধ্যেই বিধবা হলো।

কোন কথা না বলে তারাপ্রসন্ন চুপ করে শুনছিল। বরদাকান্তের দুঃখের ইতিহাস।

বরদাকান্তের স্ত্রী বললেন, 'সংসার করতে আর ভাল লাগে না বাবা। মাঝে মাঝেই তাই বেরিয়ে পড়ি। তীর্থে-টীর্থে গেলে তবু মনটা একটু ভাল লাগে।'

সারা ট্রেনে আরতির সঙ্গে একটিও কথা বলে নি তারাপ্রসন্ন। বলার প্রয়োজন বা সুযোগ আসে নি।

বরদাকান্তের লেক স্কোয়ারের কোয়ার্টারেই তারাপ্রসন্ন আছেন। অফিস করেন। মাসখানেক পরে তারাপ্রসন্ন মেসে চলে যাবার কথা জানাতেই ওঁরা আপত্তি করলেন। স্বামী-স্ত্রী দুইজনেই। কিছুতেই যেতে দিলেন না। তারাপ্রসন্ন থেকে গেলেন।

আরতি কখনও কখনও তারাপ্রসন্নর খাবার জায়গা করে দিত বা অফিস থেকে আসার পর এক কাপ চা দিয়ে যেত কিন্তু কেউ কোন কথাবার্তা বলত না। সকালে অফিস যাবার ব্যস্ততা থাকত। বিকেলে অফিস থেকে ফিরে তারাপ্রসন্ন অধিকাংশ দিনই একটা নাটক-নভেল পড়তে বসত। বরদাকান্ত রোজ সন্ধ্যার পর তাসের আড্ডায় যেতেন। যদি কোন দিন কোন কারণে তাসের আড্ডা না বসত তাহলে দুজনে বসে গল্পগুজব করতেন। দিল্লীর রাস্তাঘাট চেনার পর তারাপ্রসন্ন একটু ঘুরে ফিরে সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরতেন।

সেদিন বোধহয় একটু বেশী দেরিই হয়েছিল। দরজায় আওয়াজ করতেই আরতি এসে দরজা খুলে ভিতরে চলে গেল। নিত্যকার মতো তারাপ্রসন্ন জামা-জুতো খুলল। তারপর আলনা থেকে ধুতিটা নিতে গিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পেল না। ঘর থেকেই উঁকি মেরে দেখল বাইরে দড়িতে মেলে দেওয়া আছে নাকি। না বাইরের দড়িতে কিছু নেই। আর একবার আলনাটা খুঁজে দেখে না পেয়ে বলল, 'মাসীমা, আমার ধুতিটা কোথায় জানেন?'

জবাব না পেয়ে আবার ডাকল, 'মাসীমা, একটু এ-ঘরে আসবেন?'

মাসীমা এলেন না, এলো আরতি। 'মা নেই।'

'আমার ধুতিটা দেখতে পাচ্ছি না বলে...'

'এখানেই তো ছিল' বলে আরতিও আলনাটা খুঁজল। পেল না। 'তাহলে কি বাবা ভুল করে পরলেন?'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি সুটকেস থেকে একটা ধুতি বের করে পরছি।'

আরতি আর কোন কথা না বলে রান্নাঘরে চলে গেল।

তারাপ্রসন্ন হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে আসার পর আরতি চা দিতে এলো।

'মাসীমা কোথায়?'

'মা কীর্তন শুনতে গিয়েছেন।'

'মেসোমশাই?'

'রোজ যেখানে যান, সেই তাসের আড্ডায়।'

তারাপ্রসন্ন অবাক হলো, 'আপনি একলা বাড়িতে ?'

আরতি একটু হাসল, 'তাতে কি হলো ? আমি কি কচি শিশু যে ভয় পাব ?'

'তাহলেও ..'

'তাহলেও আবার কি ? বুড়ী হতে চললাম, এখন আর ভয় কি ?'

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে তারাপ্রসন্ন মুখ নিচু করেই বলল, 'ভয় নেই, সেকথা আলাদা, কিন্তু তাই বলে আপনি বুড়ী হবেন কেন ?'

'জানেন আমার বয়স কত ?'

'কত ?'

'আপনার চাইতে অনেক বেশী।'

তারাপ্রসন্ন একটু হাসল। 'অনেক বেশী হতে পারে না।'

'জানেন সামনের ভাদ্দরে আমি চব্বিশে পা দেব ?'

'ভাদ্দরের এখন অনেক দেরী।'

'তাহলেও তেইশ।'

'হলোই না হয় তেইশ কিন্তু তাই বলে বুড়ী হবেন কেন ?'

'মেয়েরা তো কুড়িতেই বুড়ী হয়।'

'সে অল্প বয়সে বিয়ে থা হয়ে বাচ্চা-কাচ্চা হলে আলাদা কথা।'

আরতি একটু হাসি চাপতে চাপতে আবার রান্নাঘরে চলে গেল। তারাপ্রসন্ন একটা নভেল নিয়ে পড়তে বসল। কিছুক্ষণ পরে আরতি দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'চা খাবেন ?'

'এই তো খেলাম।'

'আমি খাব তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম।'

'তখন আপনি চা খান নি!'

'খেয়েছি।'

'তবে ?'

'আমি একটু বেশী চা খাই।' একটু থেমে আবার আরতি বলল, 'চায়ের দোকানে বসে খাবার-দাবার খেতে খুব ভাল লাগত। এখন তো আর তা সম্ভব নয়; তাই মাঝে মাঝেই শুধু চা খাই।'

আরতির কথায় তারাপ্রসন্ন মুহূর্তের জন্য একটু আনমনা হয়ে গেল।

একটু পরে আবার দু' পেয়ালা চা নিয়ে এলো আরতি। একটা তারাপ্রসন্নর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এই নিন।'

চা খেতে খেতে কেউ কোন কথা বলল না। চা খাওয়া শেষ হলে আরতি জিজ্ঞাসা করল, আপনি খুব লাজুক, তাই না?'

'কে বলল?'

'কে আবার বলবে? আপনাকে দেখে মনে হয়।'

'আমাকে দেখে মনে হয়?'

'দেখে মনে হয় মানে আর কি এতদিন আছেন অথচ একদিনও কথা বলেন নি বলে ধারণা হয়েছে।'

'ঠিক জানি না তো কথা বলা উচিত হবে কিনা, তাই বলি নি।'

'উচিত হবে না কেন?'

'মানে মাসীমা-মেসোমশাই বা আপনি পছন্দ নাও করতে পারেন।'

'এতদিন এখানে থাকার পর আমাদের সম্পর্কে এই ধারণা হলো?'

তারাপ্রসন্নর ধারণা যে ভুল, তা সেবারেই প্রমাণ হলো। তারপর সম্পর্ক সহজ হতে দেরি হলো না।

বরদাকান্ত অফিসে রওনা হয়েছেন। তারাপ্রসন্নও এক্ষুনি বেরুবে। হঠাৎ আরতি এলো। 'একটা কাজ করতে পারবেন?'

'কি কাজ?'

'খুব গোপনে করতে হবে কিন্তু।'

একটু অবাক হয়ে তারাপ্রসন্ন আরতির দিকে তাকাল, 'তার মানে?'

'অফিস থেকে ফেরার পথে গোল মার্কেট থেকে গরম গরম সিঙাড়া কিনে আনতে পারবেন?' ফিসফিস করে আরতি বলল।

'তা গোপনে কেন?'

আরতি ইসারা করে চুপ করতে বলল। 'আমার ওসব খাওয়া বারণ, অথচ দারুণ খেতে ইচ্ছে করছে।'

তারাপ্রসন্নও ফিসফিস করে জানতে চাইল, 'মাসীমা-মেসোমশাই থাকবেন যে?'

'আপনি একটু দেরি করে আসবেন। ওরা তখন থাকবেন না।'

তারাপ্রসন্ন আর প্রশ্ন করে না। 'আনব।'

'একটু সাবধানে কিন্তু।'

'আচ্ছা।'

তারাপ্রসন্ন বেরুবার সময় আরতি আরো একবার সাবধান না করে পারল না, 'জানাজানি হলে কিন্তু আমার সর্বনাশ।'

বারান্দায় পা দিয়ে তারাপ্রসন্ন পিছন ফিরে আরতিকে একবার ভাল করে দেখে বলল, 'ভয় নেই, কেউ জানতে পারবে না।'

অফিস ছুটির পর রোজই দু' একজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে তারাপ্রসন্ন ঘুরে বেড়ায়। যেদিন একাই ঘুরে বেড়াল। বেড়াতে বেড়াতে ভাবছিল আরতির কথা। জীবনের সমস্ত আনন্দ থেকে বঞ্চিতা ভাগ্যহীনা বিধবার কথা। এই তো ক'টা বছরই আনন্দের সময় বসন্তের মেয়াদ তো দীর্ঘ নয়। মধ্যাহ্নের সূর্য ঢলে পড়তে কতক্ষণ? আরতি তাও উপভোগ করতে পারল না। কিছুটা অদৃষ্টের জন্য, কিছুটা মনুষ্যত্বহীন সমাজের জন্য! ভাবতে ভাবতে বিভোর হয়ে গেল সে। আরতির প্রতি সমবেদনায়, ভালবাসায় ভরে গেল সমস্ত মন।

বাবা-মা বসাক মশায়ের মেয়ের বিয়েতে যাবার জন্য টিমারপুর রওনা হবার পর থেকেই আরতি জানালার ধারে বসেছিল। দূর থেকে তারাপ্রসন্নকে দেখেই প্রায় দৌড়ে দরজা খুলতে গেল। তারাপ্রসন্ন ঘরে ঢুকতেই তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে খুব নিচু গলায় প্রশ্ন করল, 'এনেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কেউ টের পায় নি তো?'

'না না, কে আবার টের পাবে?'

'মল্লিক মশায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে নাকি?'

'কই না তো।'

'একটু আগেই উনি ঐদিকে গেলেন। তাই ভাবছিলাম যদি আবার দেখা হয় তাহলে…'

তারাপ্রসন্ন ওকে আশ্বস্ত করার জন্য বলল, 'এ পাড়ার কেউ যাতে টের না পায় সেজন্য আমি গোল মার্কেটে না কিনে বেঙ্গলী মার্কেট থেকে কিনেছি।'

'তাই নাকি ?'

'আমি কি আপনার কাছে মিথ্যে কথা বলব ?'

'না, না, তা বলছি না।'

সত্যি সত্যি বহুদিনের একটা সখ পূর্ণ হলো আরতির। তারা-প্রসন্নর প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল। 'আপনাকে খুব কষ্ট দিলাম তো ?'

'কষ্ট হবে কেন ? বরং আনন্দ হলো ?'

'আপনার আর কি আনন্দ হলো ? আনন্দ হলো আমার।'

'কেন ?'

'যে কোন জিনিস চুরি করে খেলে সত্যি আনন্দ হয়। তাছাড়া...'

'তাছাড়া কি ?'

'আপনার অনেক দিনের ইচ্ছাটা যে পূর্ণ করতে পারলাম—সেজন্য খুব ভাল লাগল।'

আরতি দৃষ্টিটা গুটিয়ে নিয়ে কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আস্তে আস্তে বলল, 'জীবনের ছোটখাট ইচ্ছাগুলো পূর্ণ করতে পারলেও এত দুঃখ, এত কষ্ট হতো না।'

'আমার দ্বারা যদি কিছু সম্ভব হয়, বলবেন। কোন লজ্জা বা কোন দ্বিধা করবেন না।'

আরতি হাসতে হাসতে বলল, 'শেষকালে কোন দিন রাগারাগি হলে সব বলে দেবেন তো ?'

হঠাৎ তারাপ্রসন্ন আরতির গায়ে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন, 'আপনার কোন কথা কোনদিন কাউকে বলব না।'

বহুদিন পর একজন যুবকের স্পর্শে আরতি কেমন যেন চমকে উঠল, 'একি, আপনি যে আমার গায়ে হাত দিলেন ?'

আরতির কথায় তারাপ্রসন্ন ছিটকে পড়ল হিমালয়ের উপর থেকে।

'সত্যি বিশ্বাস করুন, আমি হঠাৎ ভুল করে…'

বেশ গাম্ভীর্যের সঙ্গে আরতি বলল, 'ভুল করেই হোক, আর ইচ্ছে করেই হোক, আমার মতো অল্প বয়সী বিধবার গায়ে হাত দেয় ?'

তারাপ্রসন্ন আরো ঘাবড়ে গেল, 'আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন আমি মা কালীর পা ছুঁয়ে বলতে পারি…'

আরতি এবার হেসে ফেলল। 'এত ঘাবড়াচ্ছেন কেন ?'

'সত্যি আমার ভীষণ অন্যায় হয়ে গেছে।'

'আপনার চাইতে আমি আরো বেশী অন্যায় করেছি।'

'আপনি আবার কি অন্যায় করলেন ?'

'দোকানের সিঙাড়া খাওয়া আমার পক্ষে কি ভীষণ অন্যায় তা জানেন ?'

'আপনি হয়তো অনিয়ম করেছেন আর আমি অন্যায় করেছি।'

জাহ্নবী যত এঁকেবেঁকেই যাক না কেন সমুদ্রের মধ্যে বিলীন হওয়াই তার স্বপ্ন সাধনা পরিণতি। হয়তো নিয়তিও। জাহ্নবী-যমুনাকে পাবার জন্য সমুদ্রও উন্মুখ হয়ে থাকে। একটু এঁকেবেঁকে লুকিয়ে চুরিয়ে হলেও জাহ্নবীর মতো আরতিও নিয়তির দিকে এগিয়ে চলল। আর তারাপ্রসন্ন ? জাহ্নবীর জল আরতির ভালবাসার স্বাদ পাবার জন্য সমস্ত অন্তরসত্তার মধ্যে উন্মাদ হয়ে উঠল।

রায় বাহাদুর সোমেশ্বর চ্যাটার্জীর একটি কথায় তারাপ্রসন্নর অন্ধকার স্মৃতির অরণ্য দিনের আলোয় ভরে গেল। সব কথা সব স্মৃতি বহু দীর্ঘ পথ পরিক্রমণ করে অপ্রত্যাশিতভাবে একেবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। আর এগুতে পারলেন না। দৃষ্টিটা পর্যন্ত ঝাপসা হয়ে গেল। রায় সাহেব তারাপ্রসন্ন সরকার হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। হবেন না ? নিজের হৃৎপিণ্ডটা যদি নিজেই অপারেশন করতে হয় তাহলে ?

'কি হলো রায় সাহেব একটু হুইস্কি খাওয়াবেন না ?'

'সত্যি খাবেন ?'

'সত্যি খাব। বেশ খানিকটা হুইস্কি না খেলে বোধহয় আজ রাত্তিরেই

আমি পাগল হয়ে যাব।'

'আবার ঐ সব আজেবাজে কথা বলছেন?'

রায়বাহাদুর একটু শুকনো হাসি হাসলেন। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লেন। 'রায়সাহেব! আপনি তো কোনদিন মানুষ খুন করেন নি, তাজা তাজা ছেলেগুলোকে ফাঁসির কাঠে ঝোলান নি, তাই আমার যন্ত্রণা বুঝবেন না।'

তারাপ্রসন্নর মুখ দিয়ে একটি শব্দ বেরুল না কিন্তু মনে মনে চীৎকার করে উঠলেন, খুন! মার্ডার। না না খুন করি নি মার্ডার করি নি। কাউকে রিভলবার দিয়ে গুলি করি নি, ফাঁসিকাঠেও ঝোলাই নি কিন্তু....

কিন্তু কি? মনের মধ্যে কি একটা কিন্তু জমে আছে? অনেক অনেক কিন্তুর ভিড়। মনে হলো বরদাকান্তের আশ্রমে অতকাল না থাকলেই ভাল হতো।

একবার নয় কয়েকবার তারাপ্রসন্ন মেস বাড়িতে যেতে চেয়েছিলেন। 'মেসোমশাই এবার বরং আমি মেসে যাই। অনেক কাল তো আপনাদের জ্বালাতন করলাম।'

'এটা কি মাস জান?' বরদাকান্ত প্রশ্ন করলেন।

'ভাদ্র।'

'তবে? ভাদ্দর মাসে কুকুর-বেড়ালকে পর্যন্ত কেউ বাড়ি থেকে বিদায় করে না।'

এলো আশ্বিন।

বরদাকান্তের স্ত্রী বললেন, 'না বাপু সামনে পূজা। এখন আবার কোথায় যাবে?'

এমনি করে দিন এগিয়ে চলে, এগিয়ে চলে জাহ্নবী আরতি। সমুদ্র এগিয়ে আসে, কাছে আসে তারাপ্রসন্ন। মোহনা তখনও বেশ খানিকটা দূরে। তবুও সমুদ্রের গর্জনে জাহ্নবী চঞ্চলা হয়, দু'হাত প্রসারিত করে সমুদ্রকে আলিঙ্গন করার জন্য পাগল হয়ে ওঠে।

তারপর?

মাঝে মাঝে সমুদ্রের ঢেউ এসে গায়ে লাগে।

জীবন-নদীর মোহনায় দাঁড়িয়ে তারাপ্রসন্ন আবার অনুরোধ করল, 'মেসোমশাই এবার আর আপনারা বারণ করবেন না।'

বরদাকান্ত জবাব দেবার আগেই তাঁর স্ত্রী বললেন, 'এখন তুমি চলে গেলে বাড়িটা বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগবে। তাছাড়া সামনের বছর উনি রিটায়ার করলে তো আমরাও দেশে চলে যাব। আমরা চলে যাবার পরই তুমি মেসবাড়ি যেও এখন আর যেও না।'

কিন্তু ?

আর কিন্তু ? অরণ্য-পর্বত আর দীর্ঘ সমতলভূমি অতিক্রম করে যে জাহ্নবী সিন্ধু সমাগমে সমাগত সেখানে কি কোন কিন্তু তার গতিরোধ করতে পারে ?

'কি হলো রায়সাহেব ? কি এত ভাবছেন ? আমি সত্যিই হুইস্কি খাব '

তারাপ্রসন্ন তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'না, না, কি আর ভাবব ?'

'রায় সাহেব। আমি পুলিশ অফিসার। আমাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করবেন না।' রায় বাহাদুর সোমেশ্বর চ্যাটার্জী আবার একটু শুকনো হাসি হাসলেন। 'আমার কথা শুনে ভাবনা হওয়া স্বাভাবিক। ভাবছেন এতগুলো ছেলের সর্বনাশ করার পরেও লোকটা কিভাবে এতদিন সবকিছু চেপে রেখেছিলেন, তাই না ?'

তারাপ্রসন্ন ক্লান্ত শূন্যদৃষ্টিতে একবার রায় বাহাদুরের দিকে তাকালেন।

রায় বাহাদুর নিজেই আবার বলতে শুরু করলেন, 'জামা-কাপড়ের তলায় সবারই একটা নগ্ন দেহ লুকিয়ে থাকে কিন্তু উন্মাদ ছাড়া কেউ পুরো নগ্ন দেহটা দেখাতে পারে না। আমি তো পাগল নই যে সবকিছু প্রকাশ করে ফেলব।'

রায় সাহেব তারাপ্রসন্ন সরকারও পাগল না; জীবনে কত কি পেয়েছেন, কত কি হারিয়েছেন তবু পাগল হন নি। তাই তো উনিও সিন্ধুর কাছে জাহ্নবী বিলীন হবার কথা, আরভির আত্মসমর্পণের ইতিহাস

কাউকে বলেন নি। বলতে পারেন নি, পারবেন না। কিন্তু ভুলতে পেরেছেন কি? অসম্ভব। পাগল না হলে সে রাত্রের কথা ভোলা যায় না।

শীতকাল। ডিসেম্বরের শেষ। সিমলার মতো বরফ পড়ছে না কিন্তু মানুষ জমে যাচ্ছে। তারপর বিকেল থেকে বৃষ্টি নেমেছে। সঙ্গে উত্তরের ঝড়ো হাওয়া। অফিস থেকে এসেই বরদাকান্ত লেপ মুড়ি দিয়ে বিছানায় বসলেন। তারপরে চা খেয়ে গিন্নীকে বললেন, হ্যাঁগো, আজ আর অন্য কিছু রান্নাবান্নার ঝামেলা না করে খিচুড়ি কর। গিন্নী জবাব দিলেন তা তো বুঝলাম কিন্তু কয়লা-কাঠ সব ভিজে গেছে। কিভাবে যে উনুন ধরাই, তাই ভাবছি।

একটু দেরি হলেও খিচুড়ি রান্না হলো, খাওয়া হলো। আরতিও দুধ-মিষ্টি খেয়ে নিল। তারপরই শোবার পালা। তারাপ্রসন্ন বারান্দার ঘেরা জায়গায় থাকে। অন্য দুটি ঘরের একটিতে কর্তা-গিন্নী অন্যটিতে আরতি। সেদিন শুতে যাবার আগে গিন্নী বললেন, 'তারা, আজ বরং তুমি ঐ ঘরে শোও। খুকী এ ঘরেই শোবে এখন।'

তারাপ্রসন্ন শুনে অবাক হলো, 'কেন মাসীমা?'

'কেন আবার? আজ ওখানে শুলে তোমার দারুণ ঠাণ্ডা লাগবে।'

প্রস্তাবটা হেসেই উড়িয়ে দিল তারাপ্রসন্ন, লেপ মুড়ি দিলে আবার ঠাণ্ডা। আপনি কিছু ভাববেন না।'

ওরা তিন জনেই অনুরোধ করলেন। কিন্তু তারাপ্রসন্ন বার বার বলল, 'কিছু ভয় নেই। আমি মহা আরামে ঘুমোব।'

সব শেষে আরতি বলল, 'এই ঠাণ্ডায় আমরা এমন ঘুমোব যে মাঝ রাত্তিরে আপনি ডাকাডাকি করলেও আমাদের সাড়া পাবেন না।'

বরদাকান্ত লেপের ভিতর থেকেই মন্তব্য করলেন, 'মাঝ রাত্তির তো দূরের কথা, ছ্যাখ সকালে কখন উঠি।'

যে যার জায়গায় শুতে শুতেই আলো অফ হয়ে গেল। সামনের স্কোয়ারের মিস্তিরদের কোয়ার্টারে রোজ অনেক রাত অবধি আলো জ্বলে। এই শীতের মধ্যেও বারোটা-একটা পর্যন্ত আলো জ্বলে কিন্তু

আজ সে বাড়িতেও আলো নেই। এত জোরে ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে যে রাস্তায় আলোগুলো অস্পষ্ট আবছা মনে হচ্ছে। রাস্তা দিয়ে একটা টাঙ্গা পর্যন্ত যাচ্ছে না। এক কথায় মহা দুর্যোগের রাত্রি। লেপ মুড়ি দিয়ে শোবার কিছুক্ষণের মধ্যেই তারাপ্রসন্ন ঘুমিয়ে পড়ল।

তখন কত রাত্রি তা তারাপ্রসন্ন জানে না। ঘুম ভেঙে গেল। ঝড়-বৃষ্টির তেজ আরো বেড়েছে। ঠাণ্ডা বাতাস এসে বিছানাপত্র বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। লেপ মুড়ি দিয়েও শীত যাচ্ছে না। তবু অনেকক্ষণ ঐভাবে পড়ে রইল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যি অসহনীয় হয়ে উঠল। অথচ কাউকে ডাকাডাকি করতে পৌরুষে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল।

না। উঠে পড়ল। মনে মনে ঠিক করল দরজায় একটু আওয়াজ করলে যদি আরতির ঘুম না ভাঙে তাহলে ওপাশের জানলায় ধাক্কা-ধাক্কি করবে। আলনা থেকে শাল আর ফুলহাতা সোয়েটার দিতে বলবে। খুব আস্তে দরজা খুলে বারান্দায় পা দিতেই ঠাণ্ডা ঝড়ো হাওয়ায় কেঁপে উঠল। আস্তে আস্তে পা টিপে দু'পা এগুতেই তারা-প্রসন্ন চমকে উঠল। আর একটু হলেই চীৎকার করত। সারা গায়ে কম্বল জড়িয়ে আরতি দরজার সামনেই দাঁড়িয়েছিল। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তারাপ্রসন্ন এগিয়ে আসতেই আরতি একটু হাসল।

অবাক বিস্ময়ের সঙ্গে তারাপ্রসন্ন ফিসফিস করে প্রশ্ন করল, 'তুমি এভাবে দাঁড়িয়ে আছ?'

'তোমার জন্য।'

'আমার জন্য?'

আরতি তারাপ্রসন্নর হাত ধরে ঘরের মধ্যে এনে বলল, 'আমি জানতাম তুমি উঠবেই।'

তারাপ্রসন্ন কোন কথা না বলে শুধু ওর হাতখানা নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে চেয়ে রইল।

'শীত করছে?'

'হ্যাঁ। দারুণ শীত করছে।'

'এসো বিছানায় বসি।'

'না না, যদি মাসীমা-মেসোমশাই।'

'কিছু ভয় নেই। ডাকাত পড়লেও ওঁদের ঘুম এখন ভাঙবে না।'

তারাপ্রসন্ন বসল।

'পা তুলে বসো।'

তারাপ্রসন্ন পা তুলে বসল। আরতি পাশে বসে লেপটা টেনে বলল, 'কাছে এসো লেপ গায়ে দিয়ে বসি।'

বাইরের মতন ওদের দুজনের মনের মধ্যেও ঝড়ো বাতাস উঠল। প্রথমে আস্তে, তারপর তার বেগ বাড়তে আরম্ভ করল।

'কি হলো রায় সাহেব? উঠবেন না'—রায় বাহাদুর যেন আর ধৈর্য ধরতে পারেন না।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ এইত যাচ্ছি' বলে প্রায় দৌড়ে গিয়ে রায় সাহেব হুইস্কির বোতল এনে দুটো গেলাস ভরে দিলেন।

তিন

'একি জ্যেঠু! আপনি এখানে বসে আছেন?' এই ভোরবেলায় বোতল-গেলাস নিয়ে তারাপ্রসন্নকে এইভাবে বসে থাকতে দেখে অবাক-না হয়ে পারলেন না, আশুতোষের স্ত্রী।

অবাক হবেন না? তারাপ্রসন্ন মদ খান কিন্তু তাই বলে এইভাবে সামনের ঘরে দরজা খুলে? তারপর এই এত ভোরে? তাছাড়া যে অম্বর ওর প্রাণ, সে এত জোরে এতক্ষণ ধরে কাঁদছে অথচ উনি মদের বোতল নিয়ে বসে আছেন?

'কে আরতি?' তারাপ্রসন্ন হঠাৎ যেন চমকে উঠলেন।

'না জ্যেঠু আমি আরতি না, আমি হেনা, আপনার বৌমা।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমি হেনা। আরতি কোথা থেকে আসবে?'

তারাপ্রসন্নর কথায় আশুতোষের স্ত্রী আরো বেশী অবাক। এতদিন

ধরে দেখছে কিন্তু কোন দিনের জন্যও এমনভাবে কাথাবার্তা বলতে শোনে নি। অম্বর কাঁদছে বলে উনি আর না দাঁড়িয়ে শোবার ঘরে চলে গেলেন। ঘুম থেকে উঠে দাদুকে পাশে না দেখে অম্বর ভয় পেয়েছে। হেনা ওকে কোলে নিতে গিয়ে বিছানা দেখেই বুঝলেন জ্যেঠু ঘুমোতে আসেন নি। সারা রাত বাইরের ঘরে বসেই মদ খেয়েছেন।

হেনা অম্বরকে নিয়ে ওদের কোয়ার্টারে চলে গেলেন। তারাপ্রসন্নকে কোন প্রশ্ন করলেন না কিন্তু মনের অনেক প্রশ্ন অনেক জিজ্ঞাসা থেকে গেল : আরতি? কে এই আরতি? রায় সাহেব তারাপ্রসন্ন সরকার তো পিছনে ফিরে তাকান না। উনি তো অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করেন না। তবে কে এই আরতি? রায় সাহেব তারাপ্রসন্ন সরকারকে পর্যন্ত এইভাবে আনমনা করতে পারে? সারা রাত্রি অম্বরের কাছ থেকে টেনে রাখতে পারে?

অজস্র সহস্র প্রশ্ন হেনার মনে উঁকি দিতে লাগল। হঠাৎ ওকে আরতি বলে ভুল করলেন কেন? এর আগে তো কখনো এমন ভুল করেন নি?

পরের কদিন তারাপ্রসন্ন কেমন একটু আনমনা হয়ে দিন কাটালেন।

'বৌমা, অম্বর রইল। আমি যাচ্ছি।'

হেনা অম্বরকে কাছে টেনে নিয়েই প্রশ্ন করল, 'একি জ্যেঠু চটি পরেই অফিস যাচ্ছেন?'

তারাপ্রসন্ন তাড়াতাড়ি কোয়ার্টারে গিয়ে চটি ছেড়ে বুট পরে অফিস গেলেন।

মা ভগবতীর কত রূপ! কখনও দুর্গা, কখনও কালী-তারা-ভুবনেশ্বরী! আরো কত কি। মা ভগবতীর মতো একই নারীর কত রূপ! তারাপ্রসন্ন আপন মনে ভাবেন। বিয়ের আগের দিন এক রূপ, বিয়ের পরের দিন অন্য রূপ। বর্ষার পদ্মার মতো এক রাতের মধ্যে সে প্রমত্তা হয়ে ওঠে। শাঁখা, সিঁদুর আর রঙীন শাড়ী ছাড়লে আবার কি আশ্চর্যভাবে পাল্টে যায়। যেমন আশুর বৌ হেনা পাল্টেছে।

হেনাকে প্রথম দিন দেখেই তারাপ্রসন্নর ভাল লাগে। আপন মনে

হয়। স্নেহ করতে ইচ্ছে করে। ভাবভোলা উদার মদ্যপ তারাপ্রসন্নকেও হেনার ভাল লেগেছিল। তাই তো এমন সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠল।

কিন্তু।

ভাবতে গিয়েও তারাপ্রসন্ন চমকে উঠলেন। হেনা বিধবা হবার পর ঠিক আরতির মতো লাগল কেন?

আশুতোষের মারা যাবার পর থেকেই হেনাকে দেখে তারাপ্রসন্ন মনের মধ্যে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করতেন অথচ ঠিক বুঝতে পারতেন না, ধরতে পারতেন না কেন এমন অস্বস্তি হয়। রোগ হবার সঙ্গে সঙ্গেই কি রোগ ধরা পড়ে? সেদিন রাত্রে রায় বাহাদুরের কথার জন্যই সবকিছু মনে পড়ল। আরতির সমস্ত ইতিহাস। এমন কি দেশে ফিরে যাবার পর তাঁর আত্মহত্যার কথাও! নিস্তব্ধ রাত্রিতে নিঃসঙ্গভাবে গেলাস গেলাস হুইস্কি খেতে খেতে মনের রোগটাও ধরা পড়ল। হেনাকে হঠাৎ দেখলে আরতিই মনে হয়।

মানুষের মনের মধ্যে কত প্রশ্ন, কত কথা লুকিয়ে থাকে কিন্তু জীবন তো এগিয়ে চলবেই। সুখে-দুঃখে, শীত-গ্রীষ্মে সমানভাবে। এগিয়ে চলে তারাপ্রসন্নর জীবন, রায় বাহাদুরের জীবন, হেনার জীবন। দিনে দিনে তিলে তিলে বড় হয় অম্বর, বিশু। অম্বর এখন আর দাদুর কাছে শুতে চায় না, অধিকাংশ দিনই শোয় না। বিশুর সঙ্গে খেলা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে। তারাপ্রসন্ন শুতে যাবার আগে একবার রায় বাহাদুরের কোয়ার্টারে এসে হেনাকে ডাক দেন, 'হ্যাগো বৌমা, দাদু কি ঘুমিয়ে পড়েছে?'

হেনা হাসতে হাসতে জবাব দেয়, 'সে কি এখন? ওদের তো এখন মাঝ রাত্তির।'

'তাহলে?'

'তাহলে আবার কি? আমার কাছে যেমন থাকে অমনি থাকবে। আপনি নিশ্চিন্ত মনে শুতে যান।'

'কিন্তু...'

'কিন্তু আবার কি?'

'মাঝ রাতে যদি তোমাকে বিরক্ত করে ?'

'ও আজকাল কিছু বিরক্ত করে না। সেই ভোরবেলায় ঘুম ভাঙলেই দুটো বিস্কুট চাই। তাছাড়া সারা রাত্রি কোন ঝামেলা নেই।'

তারাপ্রসন্ন একাই ফিরে আসেন। প্রায় প্রতিদিনই এমন হয়।

সেদিন রবিবার। রায় বাহাদুর বিশু আর অম্বরকে নিয়ে তাল-কোটরায় বেড়াতে গিয়েছেন। রায় বাহাদুরের স্ত্রী রান্নাঘরে। রায় সাহেব সামনের বারান্দায় বসে একটা বই পড়ছিলেন। চাকরটা এই মাত্র এক কাপ চা দিয়ে গেছে। ঠিক এমন সময় হেনা এলো।

'এসো বৌমা এসো। চা খাবে ?'

'এক্ষুনি চা খেয়েছি। আর খাব না।'

'বসো।'

হেনা বসল। 'কি বই পড়ছেন ?'

'শরৎবাবুর চরিত্রহীন।'

হেনা হাসতে হাসতে বলল, 'আজকাল আপনি শরৎবাবুর বই খুব পড়েন, তাই না জ্যেঠু ?'

'কি করব বল ? তুমি সার্টিফিকেট দেবার পর না পড়ে পারি ?'

'আমার সার্টিফিকেটের এত দাম ?'

'নিশ্চয়ই।'

'যাক তবু আপনার কাছে আমার মতামতের একটা দাম আছে।'

'কেন ? আর কারুর কাছে কি নেই ?'

'থাকলেও এতটা নিশ্চয় নেই।'

'কে বলল তোমাকে ?'

'কেউ বলে নি। এমনি আমার মনে হয়।' এক মুহূর্তের জন্য একটু ভেবে হেনা বলল, 'আপনি আমাকে একটু বেশী ভালবাসেন তাই না জ্যেঠু ?'

তারাপ্রসন্ন খুশীতে হাসলেন।

'হাসলে কি হবে ? আমি ঠিকই বলেছি।'

'তোমার যদি তাই মনে হয় তাহলে আমি আর কি বলব ? ভালবাসা উপলব্ধির জিনিস, স্বীকৃতি-অস্বীকৃতিতে কিছু আসে যায় না।'

'ঠিক বলেছেন জ্যেঠু। কিরণময়ী বা উপেনের ভালবাসার কি কোন তুলনা হয় ? অথচ কোন স্বীকৃতিই ওরা পায় নি।'

তারাপ্রসন্ন আবার হাসলেন, 'তুমি পড়াশুনা করলে স্বচ্ছন্দে বি-এ এম-এ পাস করতে পারতে।'

'ইচ্ছে থাকলেও কি জীবনে সব কিছু হয় জ্যেঠু ? তাছাড়া মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের ইচ্ছা অনিচ্ছার কে মূল্য দেয় বলেন ?'

'তুমি ভারী সুন্দর কথা বল।'

হেনা একটু হাসল।

'হাসির কথা নয় বৌমা। সত্যি তোমার সঙ্গে কথা বলে বড় আনন্দ পাই।'

বিকেলের দিকে রায় বাহাদুর বিশু আর অম্বরকে নিয়ে বেড়াতে গেলে হেনা প্রায় রোজই তারাপ্রসন্নর সঙ্গে গল্প করেন। বিকেল বেলার রান্নাবান্নার কাজ রায় বাহাদুরের স্ত্রীই করেন। হেনা দুপুরের রান্না করে বলে ওকে আর এ-বেলা হেঁশেলে ঢুকতে দেন না। হাজার হোক বিধবা তো!

নানা রকম কথাবার্তা গল্প-গুজব হয়। কোনদিন কিরণময়ী-উপেনকে নিয়ে, কোনদিন সংসারধর্ম বা অন্য কোন বিষয়ে। কিরণময়ীর জন্য হেনার বড় দুঃখ, বড় সমবেদনা।

'কিরণময়ীর কি ছিল না বলুন তো জ্যেঠু ? রূপ ছিল, বুদ্ধি ছিল, সাহস ছিল। আর কি চাই ?'

হেনা প্রশ্ন করে তারাপ্রসন্নর দিকে তাকাতেই উনি বললেন, 'তা ঠিক। তবে কামনা-বাসনা বোধহয় একটু বেশীই ছিল আর সেজন্যই সবকিছু ভেঙেচুরে ছারখার হয়ে গেল।'

'কামনা-বাসনা কার নেই বলতে পারেন ? আপনার নেই ? আমার নেই ?' হেনা একটু উত্তেজিত হয়েই পাল্টা প্রশ্ন করল।

তারাপ্রসন্ন চমকে উঠলেন।

কতই বা বয়স হবে হেনার ? সাতাশ-আঠাশ। বড় জোর তিরিশ। তার বেশী তো কিছুতেই নয়। কত অজস্র কামনা বাসনা চরিতার্থ করার এই তো মরশুম অথচ ক-বছর আগেই ওর জীবনের আনন্দমেলা চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু দেহ আর মন ? তারা তো শুকিয়ে যায় নি। এখনও সতেজ—অভাবিত সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ।

তারাপ্রসন্ন আপন মনে ভাবছিলেন এইসব কথা। নানা কথা। বিধবা হেনার দুঃখের কথা। হঠাৎ আরতির একটা কথা মনে পড়ল। 'মাছ-মাংস-ডিম আর মসুরের ডাল খাই না। খেতে নেই। ওগুলো খেলে উত্তেজনা বাড়ে। কিন্তু নিয়ম করে দুধ আর ফল খেয়ে আমার শরীরটা কি হয়েছে দেখেছ ?'

আজকের মতো সেদিনও তারাপ্রসন্ন কোন জবাব দিতে পারে নি। চুপ করে বসেছিল আরতির মুখের দিকে তাকিয়ে।

আরতি বলেছিল, 'মাছ-মাংস-ডিম না খেলেই যদি সংযমী হওয়া যেত তাহলে সমস্ত হিন্দুস্থানীগুলোই সন্ন্যাসী হয়ে যেত।'

হেনার মতো আরতির এত বুদ্ধি বা রুচিবোধ ছিল না, কিন্তু সেও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিল জীবনের অনেক কথা, অনেক সমস্যা। আরতির কথায় তারাপ্রসন্ন অবাক না হয়ে পারেন না। বুঝতে পারেন ওর কথাগুলি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত অথচ সম্মতি জানাতেও দ্বিধা আসে, সঙ্কোচ আসে। জ্ঞান, সত্যকার জ্ঞান অথবা চরম সুখ-দুঃখেই তো মানুষ জীবনের পরম সত্য উপলব্ধি করতে পারে কিন্তু তারাপ্রসন্নর জীবনে তো সে অবকাশ আসে নি।

নিজের সুখ-দুঃখের কথা বলার সুযোগ আরতি বিশেষ পেত না। তাছাড়া কাকে বলবে ? মনের কথা বলার মতো মানুষ কোথায় ? তাই তো তারাপ্রসন্নর কাছে এগিয়ে এসেছিল।

'কদিন আপনার সঙ্গে খুব বকবক করেছি বলে নিশ্চয়ই আমাকে খুব খারাপ লেগেছে ?'

তারাপ্রসন্ন আশ্বস্ত করেছে ওকে, 'না, না, খারাপ লাগবে কেন ?'

'নিজের কথা বলতে পারলেও অনেকটা শান্তি পাওয়া যায়।'

'এ পাড়ায় আপনার কোন বন্ধু নেই?'

'দুজন ছিল। একজনের কলকাতায় বিয়ে হয়েছে, আরেকজন অবশ্য কাছাকাছিই থাকে।'

'তার সঙ্গে দেখাশুনা হয় না?'

'আগে হতো। এখন না।'

'কেন?'

'আমার ভাল লাগে না।' আরতি একটু অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'ও শুধু স্বামীর গল্প করে বলে আমার ভীষণ অস্বস্তি হয়, রাগ হয়।'

তারাপ্রসন্ন চুপ করে রইল।

কিছুক্ষণ পরে আরতি আবার বলল, 'যখন আমার বিয়ে হয় তখন স্বামীর গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা ঠিক বুঝতাম না কিন্তু যখন মনপ্রাণ দিয়ে স্বামীকে চাইলাম, তখনই পাট চুকে গেল।'

বেশ কিছুকাল পরে আরতি একদিন কথায় কথায় বলেছিল, 'বিধবা হয়েছি বলে কি দেহটা ইট-কাঠ দিয়ে তৈরি হয়েছে? নাকি থান কাপড় পরি বলে দেবতা হয়ে গেছি?'

হেনার কথায় আরতির কথাগুলো মনে না করে পারলেন না তারাপ্রসন্ন। 'ঠিকই বলেছ তুমি। তবে সমাজ-সংসার আর পারিপার্শ্বিকতা বিচার করে মানুষকে অনেক কিছুই মেনে নিতে হয়।'

রায় বাহাদুর বিশু আর অম্বরকে নিয়ে তালকাটরা থেকে ফিরে আসতেই হেনা উঠে যায়। তারাপ্রসন্ন চুপ করে বসে থাকেন। ভাবেন। হেনার কথা ভাবেন। শুধু দুঃখ, আক্ষেপ নয়, একটু যেন বিদ্রোহের সুর শুনতে পান ওর কথাবার্তায়। তবে কি ওর জীবনেও কিছু ঘটেছিল? কিছু চাপা পড়ে আছে দায়িত্ব কর্তব্য সমাজ-সংস্কারের অজস্র বন্ধনের নিচে? আশ্চর্য বা অসম্ভব কি?

রায় বাহাদুর রিটায়ার করলেন।

তারাপ্রসন্ন জিজ্ঞাসা করলেন, 'দেশে ফিরে যাবেন নাকি?'

'সারাজীবন অপকর্ম করার পর কোন সুখে দেশে ফিরব?'

'তাহলে ?'

'তাহলে আবার কি ? এখানেই থাকব।'

'বেঙ্গলী মার্কেটে বাড়ি ভাড়া নিলেন রায় বাহাদুর। বাড়ি ভাড়া নেবার পর রায়সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা চলে গেলে আপনি থাকবেন কিভাবে ?'

হাসতে হাসতে রায়সাহেব জবাব দিলেন, 'যেভাবে আপনারা থাকবেন।'

'বলাটা যত সহজ হচ্ছে থাকা কি অত সহজ হবে ?'

'উপায় কি বলুন রায়বাহাদুর ?'

'কষ্ট করেও আপনি না হয় থাকলেন কিন্তু ঐ বাচ্চা দুটো ? ওরা কি কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারবে ?'

তারাপ্রসন্ন চট করে কোন জবাব দিতে পারে না।

রায়বাহাদুর আবার বলেন, 'তাছাড়া বৌমা কি অম্বরকে ছেড়ে থাকতে পারবেন ?'

রায়সাহেব চুপ করেই রইলেন।

পরের দিন সকালে হেনা রায়সাহেবের শোবার ঘর গুছাতে গুছাতে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা জ্যেঠু, কদিন পর কে আপনার বিছানাপত্র গেলাস-বোতল সামলাবে ?'

রায়সাহেব সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা বৌমা, তোমার বাবা কি মদ খেতেন ?'

'হঠাৎ এ প্রশ্ন করছেন কেন ?'

তারাপ্রসন্ন হাসতে হাসতে বললেন, 'নিশ্চয়ই তোমার কোন প্রিয়-জনকে তুমি মদ খেতে দেখেছ নয়ত···'

'নয়ত কি ?'

'নয়ত আমাকে তুমি এত পছন্দ করতে না।'

রায়সাহেবের কথা শুনে হেনা এক মুহূর্তে পাথর হয়ে কোথায় যেন তলিয়ে গেল, হারিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে নিজেকে সামলে নিয়ে একটু ম্লান হাসি হেসে বলল, 'জ্যেঠু, কিরণময়ীর মতো সাহস

থাকলে আপনার কথার জবাব দিতাম কিন্তু আমার অত সাহস বা মনের জোর নেই।'

হেনার উত্তর শুনে তারাপ্রসন্ন অত্যন্ত লজ্জিত হলেও জিভ্ ফসকে বলে ফেললেন, 'কিন্তু বৌমা, আসল কথাটাই যে বলে ফেললে।'

'বলে ফেললেও তো ভয় নেই। আপনি তো আর পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ঘুরে কুৎসা রটিয়ে বেড়াবেন না।'

'আমার প্রতি তোমার এত আস্থা? এত বিশ্বাস?'

'নিশ্চয়ই, একশবার।'

'আমি তোমার কোন ক্ষতি করতে পারি না?'

'পারেন কিন্তু করবেন না।'

'কেন বলো তো বৌমা?'

'কাউকে বেশী ভালবাসলে, স্নেহ করলে তার ক্ষতি করা যায় না।' কথাটা বলেই হেনা একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল।

রায়বাহাতুর কদিন পরেই বাড়ি পাল্টালেন। হেনা বাচ্চা তুটোকে নিয়ে সব শেষে গেল। তখন রায়সাহেব অফিসে। রায়সাহেবের চাকরের হাতে একটা ছোট্ট চিঠি দিয়ে গেল। 'জ্যেঠু, আপনাকে প্রণাম করে বিদায় নেবার ক্ষমতা নেই বলেই আপনি অফিস যাবার পর ও বাড়ি রওনা হচ্ছি। আপনার দাতুর জন্য চিন্তা নেই। ও আমার কাছে অনেক কিছু না পেলেও মায়ের স্নেহ নিশ্চয়ই পাবে।'

বিকেলবেলায় অফিস থেকে ফিরে চিঠিটা পড়তে পড়তে তারাপ্রসন্নর চোখে জল এসে গেল।

'জানিস দাতু, জীবনে ঐ একটা দিনই শুধু আমি চোখের জল ফেলেছি। নিজের স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ হারাবার পর তুঃখ পেয়েছি কিন্তু চোখের জল ফেলি নি।'

অম্বর মুখ বুজে দাতুর কথা শুনেছিল।

'জীবনে যেমন অনেক পেয়েছি তেমনি না পাবার তুঃখও কম সহ্য করি নি। আজ এতদিন পর যখন হিসাব-নিকাশ করতে বসি, তখনই এই মেয়েটার কথা বড় বেশী মনে হয়। পরের জন্মেও ওর ঋণ শোধ

করতে পারব কিনা জানি না।'

বিশুকে দেখলেই অম্বরের অনেক কথা মনে হয়। বহুদিনের বহু স্মৃতি একসঙ্গে মনের মধ্যে ভিড় করে। কিছু ঝাপসা, কিছু স্পষ্ট। কিছু মনে পড়ে. কিছু ভুলে গেছে। তবে সব চাইতে দাদুর একটা কথা, একটা অনুরোধ, উপদেশ সব চাইতে বেশী মনে পড়ে। চন্দনাকে দেখলে মনে পড়বেই। 'বুঝলি দাদু, মাতৃঋণ শোধ করতে নেই, শোধ করা যায় না। একেবারেই অসম্ভব। হেনা বেঁচে থাকলে তবু বলতাম ওর গোলাম হয়ে থাকিস কিন্তু ও তোকে শুধু দিয়েই গেল, তোর কাছ থেকে কিচ্ছু নিল না। তাইতো বলছি বিশু-দাদুকে দেখিস। তোর দ্বারা যেন ওর কোন ক্ষতি না হয়।'

বুড়ো তারাপ্রসন্ন বিশুকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলতেন, ছোট দাদু, তোদের দুজনের যেন ছাড়াছাড়ি না হয় কোন দিন। বৌমা নেই কিন্তু ওর আত্মা তোদের আশেপাশেই ঘোরাঘুরি করে। দেখিস ওর আত্মা যেন কোন কষ্ট না পায়।

না, ওরা ছাড়াছাড়ি হয় নি। একে একে যখন সবাই চলে গেলেন, পড়ে রইল শুধু ওরা দুজনে, তখন ওরা আরো বেশী নিবিড় হলো, ঘনিষ্ঠ হলো। দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল কত মাস, কত বছর। বিশু আর অম্বর আর্কিটেকট হলো।

'ভাবতে পারিস বিশু, আজ নতুন মা আর দাদু থাকলে কি কাণ্ডটাই না হতো।' রেজাল্ট বেরুবার পর সারাদিন দুজনে মিলে বাইরে বাইরে ঘুরে-ফিরে, সিনেমা দেখে, রেস্তোরাঁয় খেয়ে বাড়ি ফিরতেই অম্বর বলল।

বিশু আনন্দে শিস দিয়ে গান গাইতে গাইতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। একবার মায়ের ফটোটার দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে অম্বরের কাঁধে হাত রেখে বলল, 'মন খারাপ করিস না।'

আর একটিও কথা বলতে পারল না ওরা দুজনে। কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে দুজনে শুয়ে পড়ল।

'অম্বু, ঘুমিয়েছিস?'

'না।'

'রেজাল্ট দেখার পরই বাড়িতে এসে মা আর দাদুর ফটোতে প্রণাম করা উচিত ছিল, তাই নারে?'

'আমি তোকে বলেছিলাম। তুই তো শুনলি না।'

'আমি হঠাৎ এমন মেতে উঠি যে তখন কিছুই খেয়াল থাকে না।'

'তাই বলে মার ফটোতে প্রণাম করতেও ভুলে যাবি?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বিশু বলল, 'সত্যি ভীষণ অন্যায় হয়ে গেছে।'

অম্বর কিছু বলল না। দুজনেই চুপচাপ শুয়ে রইল কিন্তু কারুরই চোখে ঘুম এলো না অনেকক্ষণ।

'যাই বলিস অম্বু, তুই কিন্তু আমার চাইতে মাকে বেশী ভালবাসিস।'

'জানি না।'

'তুই না জানলেও আমি তো বুঝতে পারি।'

সময় আপন বেগে এগিয়ে চলল। বিশু হঠাৎ একটা টেম্পোরারী চাকরি পেল ভূপালে। অম্বরকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি করি বলতো অম্বু?'

'কি আবার করবি? নিয়ে নে।'

'একে তো টেম্পোরারী, তারপর মাইনে কম। তাও আবার ভূপালে।'

'একেবারে বসে থাকার চাইতে তো ভাল।'

'তুই একলা একলা থাকবি কি করে?'

'তুইও তো ভূপালে একলাই থাকবি।'

'আমি তো আর তোর মতন সেন্টিমেন্টাল না।'

'সেন্টিমেন্টাল হলাম তো কি হলো?'

'একে তো সারাদিন কোন কাজকর্ম নেই, তারপর সেন্টিমেন্টাল। হয়তো সারাদিন দাদু আর মার ফটোর সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কাঁদবি।'

অম্বর বিশুকে বকুনি না দিয়ে পারল না, 'তুই বড্ড বাজে বকিস।'

বিশু ভূপালে চলে গেল।

জীবনে এই প্রথম ওরা ছাড়াছাড়ি হলো। ভূপালে পৌঁছেই বিশু

চিঠি দিল, 'ভাই অম্বু, ঠিক মতনই এসে পৌঁছেছি কিন্তু তোকে ছেড়ে এসে একটুও ভাল লাগছে না। সব সময়ই তোর কথা মনে পড়ছে। এখন মনে হচ্ছে চাকরিটা না নিলেই ভাল হতো। দিল্লীতে দুজনেই যে চাকরি পাব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বড় জোর দু'এক মাস দেরি করতে হবে। বাবার ইন্সিওরেন্সের পুরো তিন হাজার টাকাই তো পোস্টাফিসে পড়ে আছে। ভয় কি তোর চিঠি পেলেই আমি রওনা দিতে পারি।'

চিঠিটা পেয়ে অম্বর হাসল! মনে মনে বলল, কিরে! কে সেন্টিমেণ্টাল। তুই না আমি? লিখল, হাজার হোক জীবনের প্রথম চাকরি করছিস। নিশ্চয়ই মন দিয়ে কাজ করে সবাইকে খুশী করবি। তাছাড়া এখানে একটা ভাল চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত ও চাকরি ছাড়ার কোন কথাই উঠতে পারে না। আমি ভালই আছি। আমার জন্য চিন্তা করিস না। স্বরূপ সিং কোম্পানীতে একটা দরখাস্ত দিয়েছি। হয়তো হতে পারে। তোর সব খবর জানাস।

দেখতে দেখতে আরো কয়েকমাস পার হলো। ভূপালে বিশু বেশ জমিয়ে নিয়েছে। স্বরূপ সিং কোম্পানীতে নয়, চৌধুরী অ্যাণ্ড গুপ্তা'তে অম্বরও একটা চাকরি পেয়েছে। তবে চাকরিতে জয়েন করার আগে অম্বর ক'দিনের জন্য ভূপাল গিয়েছিল। সেখান থেকে দু'জনে দিল্লী ঘুরে গেছে এক সপ্তাহের জন্য।

এর মধ্যে অম্বর বাবর রোডের ইন্দুবাবুর ছেলের বিয়ের বরযাত্রী গেল পুসা রোডে। তিন-চারজন ভদ্রলোক বরযাত্রীদের আদর-অভ্যর্থনা করছিলেন। অম্বর চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখতেই একজন এগিয়ে এসে বললেন, 'এই নিন সিগারেট।'

অম্বর হাত জোড় করে বলল, 'ধন্যবাদ! আমি সিগারেট খাই না?'

'সে কি? ইয়ংম্যান সিগারেট খান না?'

'না, আমি খাই না।'

বরযাত্রী এসে সিগারেট খাবেন না, সে কি হয়? নিন, একটা তুলে নিন।'

'সত্যি আমি সিগারেট খাই না। খেলে নিশ্চয়ই নিতাম।'

'আজকাল তো প্রায় সব ছেলেরাই সিগারেট খায়। আপনি দেখছি রিয়েলি একজন একসেপসন।'

বয়স্ক ভদ্রলোক এত সম্মান করে কথাবার্তা বলছেন বলে অম্বর অস্বস্তিবোধ করে, 'আমি আপনার চাইতে বয়সে অনেক ছোট। আমাকে আপনি বলার কোন দরকার নেই।'

খাওয়া-দাওয়ার পর ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি দিল্লীতেই থাকেন ?'

'হ্যাঁ। আমি দিল্লীরই ছেলে।'

'কোথায় থাকেন ?'

'বেঙ্গলী মার্কেটে।'

'বরাবরই ওখানে আছেন ?'

'না। আগে বেয়ার্ড রোডে থাকতাম। তবে সে অনেককাল আগে।'

'বেয়ার্ড রোড ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার বাবার নামটা জানতে পারি ?'

'আমার বাবাকে চিনবেন না, উনি দেশে থাকতেন। তবে আমার দাতুকে চিনতে হয় তো...'

'কে আপনার দাতু ?'

'রায় সাহেব তারাপ্রসন্ন সরকার।'

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'তুমি অম্বর ?'

'হ্যাঁ।'

ভদ্রলোক একটু উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আমাকে চিনতে পারছ কি ?'

একটু সঙ্কোচের সঙ্গে অম্বর ওঁর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'না, ঠিক চিনতে পারছি না তো।'

'আমি পবিত্র মুখার্জী। এবার মনে পড়ছে ?'

অম্বর জবাব দেবার আগেই ভদ্রলোক আবার বললেন, 'রাঙা কাকিমার কথা মনে আছে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। মনে পড়েছে। আপনি কি চন্দনার বাবা?'

'তাহলে মনে পড়েছে দেখছি।'

অম্বর প্রণাম করতেই উনি ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন, 'কত দিন পরে তোমাকে দেখছি।'

তারপর ঐ বিয়ে বাড়ির ভিড়ের মধ্যেই পবিত্রবাবু অম্বরকে নিয়ে হৈচৈ শুরু করে দিলেন। প্রথমে গিন্নীর কাছে নিয়ে বললেন, 'চিনতে পারছ?'

'কে বলো তো?'

অম্বর সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'রাঙা কাকিমা, আমি অম্বর।'

'ও অম্বর! তুই এত বড় হয়ে গেছিস?'

অম্বর প্রণাম করবার আগেই রাঙা কাকিমা, ওকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'এখনও পায়েস খেতে অমনি ভালবাসিস তো?'

'এখন আর পাই কোথায়?'

অম্বরের কথাটা শুনে রাঙা কাকিমার বড় কষ্ট হলো। 'কবে আসবি বল পায়েস খেতে?'

'যেদিন বলবেন।'

'কাল তো এই বিয়ে বাড়িতেই ব্যস্ত থাকব; কাল আর আসিস না। পরশু আয়।'

'দুপুরে অফিস আছে। সন্ধ্যার পর আসব।'

'বেশী রাত করিস না যেন।'

'এতদিন পর আপনার হাতের পায়েস খাব, দেরি করি কখনও? হয়তো অফিস থেকেই সোজা চলে আসব।'

'সেই ভালো। অফিস ছুটি হলেই চলে আসবি।'

'আসব।'

অম্বর রাঙা কাকিমাকে প্রণাম করতেই পবিত্রবাবু বললেন, 'চল, এবার চন্দনার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিচ্ছি।'

বিয়ে বাড়ির সর্বত্র একদল মেয়ের জটলা। চন্দনাকে খুঁজে বের করতে বেশ একটু সময় লাগল।

'হ্যাঁরে খুকু, একে চিনতে পারছিস ?'

হঠাৎ একজন সুন্দর লাজুক ধরনের যুবকের সামনে হাজির করে এমন প্রশ্ন করতেই চন্দনা একটু অপ্রস্তুত হলো। এক ঝলক দেখে নিয়ে বলল, 'না তো।'

অম্বর হাসতে হাসতে বলল, 'একবার ভাল করে আমার কপালের দিকে তাকিয়ে দেখো তো চিনতে পার কিনা।'

সামান্য একটু মুখটা তুললেও অম্বরের মুখের দিকে ভাল করে চাইতে পারল না চন্দনা।

পবিত্রবাবু আর ধৈর্য ধরতে পারলেন না, 'ওরে, এ আমাদের অম্বর। এবার চিনতে --'

'তুমি অম্বরদা ?'

'তবে কি ভূত ?'

চার

বহুকাল পরে রাঙা কাকিমার হাতের পায়েস খেতে খেতে অম্বরের অনেক কথা মনে পড়ল। ছোটবেলায় সে-সব সোনালী দিনগুলো বেশ কাটত। দাদুর আদর নতুন মার ভালবাসা, ঠাম্মার কাছে গল্প শোনা, ছোট দাদুর সঙ্গে বিকেলে বেড়ানোর উপরে ছিল রাঙা কাকিমার পায়েস।

'তুই আর বিশু যেদিন প্রথম স্কুলে গিয়েছিলি সেদিনকার কথা মনে আছে ?' রাঙা কাকিমা অম্বরকে প্রশ্ন করলেন।

'না, ঠিক মনে নেই।'

'পাছে তুই কান্নাকাটি করিস বলে হেনা সারাদিন স্কুলে একটা টিফিন কৌটোয় পায়েস নিয়ে বসে ছিল।'

শুনতে ভারি মজা লাগল অম্বরের। হাসল।

চন্দনা জিজ্ঞোসা করল, 'পায়েস কি তুমি করে দিয়েছিলে ?'

রাঙা কাকিমা উত্তর দেবার আগেই অম্বর পাল্টা প্রশ্ন করল, 'তবে কি তোমার তৈরি পায়েস নিয়ে নতুন মা স্কুলে গিয়েছিলেন ?'

'একদিন আমার হাতের পায়েস খেয়ে দেখো। মাথা ঘুরে যাবে।'

রাঙা কাকিমা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'ওর হাতের পায়েস কিন্তু সত্যি খুব ভাল।'

'ঠিক আছে। সামনের শনিবার পরীক্ষা করব।'

কাকু আর কাকিমা প্রায় একসঙ্গেই বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আসবি।'

চন্দনা বলল, 'দুধ পাঠিয়ে দিও। পায়েস করে দেব।'

এমনি গল্পগুজব হাসি-ঠাট্টা করে অম্বরের বেশ কাটল সে সন্ধ্যাটা। অনেক কাল পরে দেখা হলেও ওরা কেউই পাল্টান নি। ঠিক আগের মতোই আছেন। পবিত্রবাবুকে যে রায়সাহেব চাকরি দিয়েছিলেন, সেকথা উনি ভোলেন নি। সেদিন কথায় কথায় বার বার বললেন সেকথা। 'জান অম্বু, তোমার দাদুর মতো উদার মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। উনি যে কত লোকের উপকার করেছেন, তার ঠিক ঠিকানা নেই।'

অম্বরের শুনতে ভীষণ ভাল লাগছিল।

'অথচ দুঃখের কথা কি জান ? যারা ওর দয়ায় করে খাচ্ছে, তারাই ওর বেশী নিন্দা করে।'

এসব অম্বর জানে। তাই শুধু একটু হাসল।

রাঙা কাকিমা বললেন, 'তোর বোধহয় বলাই বিশ্বাসের কথা মনে নেই। জ্যেঠু না হলে উনি কি জীবনে কোনদিন অফিসার হতে পারতেন ? অথচ আমাদের ঘরে জ্যেঠুর ফটোটা দেখলেই যা তা বলবেন।'

অম্বর আবার একটু হাসল।

রাঙা কাকিমার হাতে পায়েস খেতে তো ভাল লাগলই কিন্তু তার

চাইতে আরো ভাল লাগল ওদের আদর, ভালবাসা। সহজ সরল, পরমাত্মীয়ের মতো ব্যবহার। মাঝে মাঝে টুকটাক মন্তব্য করলেও চন্দনা সংযত। হাজার হোক বড় হয়েছে, কলেজে পড়ছে। ছোটবেলায় খেলার সঙ্গিনী চন্দনাকে এতকাল পরে দেখে অম্বরের মনটা খুশীতে ভরে গেল।

'ছোটবেলায় তুমি কি দারুণ ঝগড়াটে আর মারপিটে ছিলে, তা জান?' অম্বর জানতে চাইল।

'ছোটবেলায় সবাই ঐ রকম থাকে।'

'মোটেও না। তোমার মতো কেউ মাথা ফাটিয়ে দেয় না।'

চন্দনা লজ্জা পায়। মুখ নিচু করে সলজ্জ হাসি হাসে।

'এখনও কত লোক আমার কপালে কাটা দাগ দেখেই জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু বলতে পারি না তুমি খুন্তী দিয়ে আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল।'

চন্দনা বলল, 'সেটা কি আমার প্রতি মহত্ত্ব দেখাবার জন্য? নাকি নিজের দুর্বলতা ঢাকার জন্য?'

'বাঃ। তুমি তো ভারী চমৎকার কথা বলো।'

দুইজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকে। তারপর অম্বর জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কোন্ কলেজে পড়ছ?'

'লেডী আরউইনে।'

'তাহলে তো আমাদের বাসার খুব কাছে।'

'হ্যাঁ।'

'কলেজ ছুটির পর চলে এসো মাঝে মাঝে।'

'আমরা বন্ধুবান্ধব মিলে ওদিকে তো প্রায়ই যাই।'

'কেন?'

'ফুচকা, আলুর টিকিয়া খেতে।'

অম্বর হাসতে হাসতে বলল, 'আমাদের পাড়ার ঐ দোকানগুলো সত্যি দারুণ-পপুলার।'

কয়েক দিন পরে সকালের দিকে অম্বর অফিস যাবার জন্য তৈরী

হচ্ছে, এমন সময় কে এসে 'বেল' বাজাল। ভাবল, বোধহয় বিশুর এক্সপ্রেস ডেলিভারী চিঠি এসেছে। দরজা খুলে দেখল চন্দনা।

'একি তুমি? হঠাৎ এ সময়?'

'মাতৃ আজ্ঞা পালন করবার জন্য এসেছি।'

'তার মানে?'

'হাতের কৌটো দেখে বুঝতে পারছ না?'

'নিশ্চয়ই কিছু খাবার-দাবার পাঠিয়েছেন।'

দরজার বাইরেই দাঁড়িয়েছিল চন্দনা। তাই চন্দনা প্রশ্ন করল, 'তোমার ঘরে ঢোকা কি বারণ?'

অম্বর লজ্জিত হলো। 'সরি। এসো, ভিতরে এসো।'

খাবারের কৌটোটা সামনের সেন্টার টেবিলে নামিয়ে রেখে চন্দনা একবার সমস্ত ঘরটা দেখল। 'ঘর দেখলে তা মনে হয় না ব্যাচিলারের ফ্ল্যাট।'

'তাই নাকি?'

'সত্যি, ভারী সুন্দর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন।'

'ভয় নেই, বিশু একদিনের জন্য এলেই সব বারোটা বাজিয়ে দেবে।'

'ও বুঝি ভীষণ অগোছাল?'

'ও একদিন থাকার পর এসো। মনে হবে ভূতের নৃত্য হয়ে গেছে ঘরের মধ্যে।' অম্বর থেমে বলল, 'যাই হোক বসো।'

হাতের ঘড়িটা দেখে পাশের সোফায় বসতে বসতে চন্দনা বলল, 'আর বিশেষ সময় নেই।'

'ক্লাস ক'টায়?'

'রোজই ন'টায় শুরু হয়; তবে আজ ফার্স্ট পিরিয়ডের লেকচারার আসবেন না।'

'ক্লাস শেষ হয় ক'টায়?'

'অধিকাংশ দিনই সাড়ে চারটেয়।'

'একটু বসো। আমি জুতোটা পরে আসি। এক সঙ্গেই বেরুব।'
কয়েক মিনিটের মধ্যেই অম্বর তৈরী হয়ে এলো। 'চলো'।

'তোমার খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে ?'

'সকালে বিশেষ কিছু খাই না।'

'না খেয়েই অফিস যাও ?'

'ঐ একটু বিস্কুট বা কেক-টেক খেয়ে নিই।'

'ভাত খাও না ?'

'লাঞ্চের সময় মাদ্রাজী হোটেলে খাই।'

'আর রাত্রে ?'

'রাত্রেও কোন কোনদিন ওখানেই খাই। নয়ত রুটি-মাখন-দুধ।'

চন্দনা আরেকবার হাতের ঘড়িটা দেখল। একটু কি যেন ভাবল। তারপর বলল, 'প্লেট আছে ?'

'আছে। কিন্তু কেন ?'

'একটা প্লেট দাও তো।'

অম্বর ভিতর থেকে একটা প্লেট এনে ওর হাতে দিতেই চন্দনা কৌটা খুলে পায়েসটা ঢেলে দিল। 'নাও, খাও।'

'এতখানি পায়েস এখনই খাব ?'

'মোটেও এতখানি না। খেয়ে নাও।'

শুরু হলো চন্দনার আসা-যাওয়া। কখনও সকালে খাবারের কৌটো নিয়ে, কখনও বিকেলের দিকে ফুচকা আর আলুর টিকিয়া খাবার লোভে। এছাড়া প্রায় প্রতি রবিবারই রাঙা কাকিমার নেমন্তন্ন। এর মধ্যে একবার দু'দিনের জন্য বিশু এসেছিল। অম্বর অনেকবার বলল রাঙা কাকিমার ওখানে যেতে কিন্তু ও গেল না। দিল্লীর পুরানো বাঙালী বাসিন্দাদের ও বিশেষ পছন্দ করে না। ওর ধারণা অনেকেই ওর আড়ালে সোমেশ্বর দারোগার নাতি বলে ওকে নিয়ে ঠাট্টা করে, হাসাহাসি করে। পবিত্র মুখার্জী রায় বাহাদুর সোমেশ্বর চ্যাটার্জীর অনেক কীর্তির কথা জানলেও ওর নিন্দা করেন না। উনি ঠিক ঐ ধরনের মানুষ না। অম্বর সব বলল, তবু বিশু গেল না।

'কি হলো অম্বু, বিশু এলো না ?' রাঙা কাকিমা জিজ্ঞাসা করলেন।

'না কাকিমা, ও অফিসের কাজে খুব ব্যস্ত।'

'ওকে দেখতে ভীষণ ইচ্ছে করে। অনেক কাল দেখি না তো।'

'পরের বার এলে নিয়ে আসব।'

'নিশ্চয়ই নিয়ে আসিস।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ আনব।'

খুব বেশী লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে অম্বর পছন্দ করে না কোন কালেই। এখনও করে না। অফিস ছাড়া মাঝে মাঝে রাঙা কাকিমার ওখানে যায়। নয়ত বাড়িতে থাকে। বইপত্র-জার্নাল পড়ে। অথবা কোন ডিজাইন নিয়ে বসে। তাতেও যখন সময় কাটে না তখন বাড়িতে রান্না শুরু করল।

সেদিন ছুটি ছিল। রান্নাই শুরু করল দশটার পর। খেতে খেতে ছুটো বেজে গেল। তারপর শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়তে পড়তে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে তা নিজেই টের পায় নি। ঘুম ভাঙল কলিং বেলের আওয়াজে। পর পর কয়েকবার বেশ জোরে বেল বাজতেই তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠল। তখন বেলা পড়ে গেছে, প্রায় সন্ধ্যা লাগে লাগে। ঘড়িটা দেখবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দেরি হবে বলে তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজাটা খুলল। চন্দনাকে দেখে বলল, 'তুমি এ সময়?'

চন্দনা সে কথার জবাব না দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি বুঝি ঘুমুচ্ছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'এই সন্ধ্যেবেলা পর্যন্ত কেউ ঘুমোয়?'

ঘরের আলোটা জ্বালতে জ্বালতে অম্বর বলল, 'বই পড়তে পড়তে অনেক বেলায় ঘুমিয়েছি।'

'তুমি বিকেলে কোথাও যাও-টাও না?'

'কোথায় আবার যাব।'

'কোথায় আবার যাব মানে? এই সময় কেউ বাড়িতে বসে থাকে?' চন্দনা যেন একটু রাগ করেই কথাগুলো বলল।

অম্বর একটু সহজ হবার জন্য বলল, 'বাড়িতে না থাকলে কি তোমার সঙ্গে দেখা হতো?'

'সে কথা ছাড়। তাই বলে এই সময় কেউ একলা একলা বাড়িতে বসে থাকে না।'

'আগে বসো। তারপর তোমার কথার জবাব দিচ্ছি।'

'বসছি। কিন্তু আমার কথার জবাব দাও।'

'আমি একলা মানুষ একলাই থাকি।'

'একলা বলে কি কোন বন্ধুবান্ধবও থাকতে নেই?'

'আলতু ফালতু লোকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব করতে ভাল লাগে না।'

'তাই বলে কি একজনও তোমার বন্ধু নেই?'

'বিশু ছাড়া আমার আর কেউ নেই।'

'এত বড় বাড়িতে একলা থাকতে ভাল লাগে?'

'ভাল লাগে না, তবে অভ্যাস হয়ে গেছে।'

চন্দনা আর কোন প্রশ্ন করল না। অম্বরও চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'আজ ছুটির দিন তুমি কোথায় গিয়েছিলে?'

'ক'জন বন্ধুতে মিলে কনট্প্লেসে সিনেমা দেখতে এসেছিলাম।'

'কি খাবে বল।'

'কিছু না।'

'তাই কি হয়? চা না কফি?'

'তোমাকে আর চা-কফি বানাতে হবে না।'

'আমিও তো বিকেলে চা কফি খাই নি। বসো; আমি এক্ষুনি আসছি' বলে অম্বর ভিতরে চলে গেল।

কয়েক মিনিট পরে চন্দনাও উঠল। শোবার ঘর পেরিয়ে রান্নাঘরে।

'তুমি আবার রান্নাঘরে এলে কেন?'

'তোমার সংসার দেখতে।'

'আমার সংসারে কি দেখার কিছু আছে?'

রান্নাঘরের চারিদিকে চোখ বুলিয়ে চন্দনা একটু চাপা হাসি হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি বিয়ে করেছ, অম্বরদা?'

অম্বর হাসল, 'হঠাৎ এমন অদ্ভুত প্রশ্ন করছ?'

তোমার রান্নাঘর দেখে মনে হচ্ছে তোমার আর আজকাল মাদ্রাজী

হোটেলে যেতে হয় না।'

'এই রান্নাঘরে গিন্নীকে ঢোকাবার আগে তোমারা জানতে পারবে।'

'এইসব রান্নাবান্না কে করল?'

'কে আবার করবে? আমিই নিজেই।'

'তুমি?' চন্দনা সত্যি অবাক হয়।

'হ্যাঁ আমি।'

'তুমি রান্না করতে পার?'

'পারতাম না, সম্প্রতি শিখেছি।'

'মাস্টারনীটি কে?'

অম্বর হেসে বললে, 'তোমার মতো কোন সুন্দরী নয়।'

'সুন্দরী না হয় নাই হলো কিন্তু তিনি কে?'

'চলো। চা খেতে খেতে বলছি।'

চা নিয়ে ওরা দুজনে ড্রইংরুমে এসে বসল। চায়ের কাপে দু' একবার চুমুক দিয়ে অম্বর বলল, 'বাড়িতে তো বিশেষ কাজ থাকে না, তাই একটা রান্নার বই কিনে নিজেই রান্না করছি।'

'বই পড়ে পড়ে রান্না শিখেছ?'

'হ্যাঁ।'

'তাই বুঝি এতদিন আমাদের ওদিকে যাচ্ছ না?'

'না, সেটা ঠিক কারণ নয়।'

'তবে?'

চা খাওয়া শেষ করে অম্বর চন্দনার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'সত্যি জানতে চাও?'

'কেন, বলতে আপত্তি আছে?'

'না, না, আপত্তি নেই। তবে তোমার কি শুনতে ভাল লাগবে?'

'তোমার বলতে আপত্তি না থাকলে আমারও শুনতে আপত্তি নেই।'

অম্বর একটু চুপ করে থাকল। ভাবল। তারপর বলল, 'দাদু আর নতুন মার জন্য আমি বড় আতুরে। মানুষের আদর-ভালবাসা পেলে আমি নিজেকে সামলাতে পারি না...'

'তাতে কি হলো ?'

'তাই ভাবলাম অত বেশী যাতায়াত ঠিক হবে না।'

'তুমি তো আচ্ছা লোক!'

'না চন্দনা, তুমি ঠিক আমাকে বুঝতে পারছ না। আমি তো বেশী লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করি না, তাই মিশতে গেলে বড় বেশী এগিয়ে যাব। সেটা ঠিক নয়।'

'কেন ?'

চন্দনার কথাটা যেন অম্বর শুনতেই পেল না। আপন খেয়ালে আবার বলতে শুরু করল, 'তোমার সঙ্গে ছোটবেলায় খেলাধূলা করেছি ঠিকই কিন্তু এখন তো তুমি বড় হয়েছ।'

চন্দনা মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'তাতে কি হলো ?'

'কিছু হয় নি, কিন্তু তোমাকে নিয়ে কেউ কিছু বলাবলি করুক, তা আমি চাই না।'

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ? কে আবার বলাবলি করবে ?'

'এখন কেউ কিছু বলছে না বলে কি ভবিষ্যতেও বলবে না ?'

'ঐসব আজেবাজে চিন্তা বাদ দাও তো।' একটু থেমেই আবার বলল, 'আমি যে তোমার এখানে আসি ?'

'তুমি তো আর রেগুলার আস না। তাছাড়া এ পাড়ার সবাই আমাকে চেনে, কেউ কিছু মনে করবে না।'

'যাই হোক এখন ওঠ। আমার সঙ্গে চল।'

'কোথায় ?'

'কোথায় আবার ? আমাদের ওখানে!'

'কেন ?'

'মা বলেছেন।'

'রাঙা কাকিমা বলেছেন ?'

'তবে কি আমি মিথ্যে কথা বলছি ?'

'না, তা বলছি না তবে...'

'মা বলেছেন বলেই তো আমি এলাম।'

'কিন্তু আমার রান্নাবান্না তো হয়ে গেছে।'

'তা হোক। তুমি এখন চল।'

'তাহলে চল।'

মানুষ কত কথা বলে কিন্তু মনের কথা মনে থেকে যায়। তা বলা হয় না, বলা যায় না। কাউকেই না, কখনই না। শৈশবে না, কৈশোরে না, যৌবনে না, বার্ধক্যে না। সারা জীবনেই বলা হয় না মনের কথা। সভ্যতার অনেক অবদান কিন্তু কেড়ে নিয়েছে মানুষের সারল্য। স্বভাব, চরিত্র, রূপ ভাল হয়, মন্দ হয়, কিন্তু মন? সে শরতের আকাশের মতো নির্মল, মালিন্য মুক্ত। গঙ্গাজল ঘোলা হলেও গঙ্গোত্রীর জল স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো পরিষ্কার।

অম্বর যায়, চন্দনা আসে, রাঙা কাকিমা পায়েস খাওয়ান কিন্তু. তবু যেন মন ভরে না। আশা মেটে না। ছোট্ট-ছোট্ট এক-একটা বুদ্বুদ জমতে জমতে বিরাট একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়।

'একটা কথা জিজ্ঞাসা করব অম্বরদা?'

'বল।'

'উত্তর দেবে তো?'

'পারলে নিশ্চয়ই দেব।'

'না পারার মতো প্রশ্ন করব না।'

'তাহলে ঠিকই উত্তর পাবে।'

'আচ্ছা, তুমি সব সময় এত কি ভাব বলো তো।'

'ভাবি নাকি?' অম্বর হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল।

মাথা দোলাতে দোলাতে চন্দনা বলল, 'তুমি জান না, তাই না?'

'আমি তো কোনদিনই বেশী কথাবার্তা বলি না।'

'তা তো জানি। কিন্তু তবুও সব সময় তুমি যেন কি ভাবছ মনে হয়।'

অম্বরের ঠোঁটের কোণায় একটু হাসির রেখা ফুটে ওঠে। 'তুমি আমাকে বেশ লক্ষ্য করেছ।'

'করেছি বৈকি।'

'কেন ?'

'কেন আবার ? তোমাকে এত চুপচাপ দেখতে ভাল লাগে না।' চন্দনা একটু চুপ করে থেকে বলে, 'আমাদের বাড়ির সবাই তোমার কথা কত ভাবে, তা জান ?'

'তুমিও ভাব ?'

'ভাবি বৈকি।'

'কি ভাব ?'

মাথাটা নেড়ে চন্দনা বলে, 'অত বলতে পারব না।'

'বল না কি ভাব।'

'ভাবি তুমি কেন এত চুপচুপ থাকো।'

চন্দনার কথাটা ভীষণ ভাল লাগে অম্বরের। একটু হাসে। খুশীতে মনটা ভরে ওঠে মুহূর্তের জন্য। চন্দনার কানের কাছে মুখটা এগিয়ে নিয়ে একটু চাপা গলায় প্রশ্ন করল, 'কাকু বা রাঙা কাকিমা জানেন না তো ?'

ঝট করে মুখ সরিয়ে নিয়ে চন্দনা বলল, 'জানি না।'

অম্বর হাসে।

মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত। তারপরই চন্দনা কেমন যেন অদ্ভুত গলায় বলল, 'না অম্বরদা, তুমি এমন চুপচাপ থাকবে না তো! আমার ভীষণ খারাপ লাগে।'

'চন্দনা!'

চন্দনা কোন উত্তর দেয় না, দিতে পারে না।

'চন্দনা!' অম্বর আবার ডাকল।

'কি ?'

'আর একটু ভেবে দেখবে না ?'

'কি আবার ভাববো ?' অম্বরের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে বলল, 'ভাবার কি আছে ?'

'তাহলে আমিও আর কিছু ভাববো না তো ?'

'না।'

ভাদ্দরের মেঘ কেটে গেল, ঝলমল করে উঠল শরতের সকাল। জীবন এগিয়ে চলে।

অম্বরের, চন্দনার, বিশুর। বিশু ভূপাল ছাড়ে নি, কিন্তু অম্বর নতুন চাকরি নিল। চন্দনার ফাইন্যাল পরীক্ষা হয়ে গেছে। পবিত্রবাবুর একবার হার্ট অ্যাটাক হয়ে তিন মাস উইলিংডনে ছিলেন। এখন ভাল। অফিস যাচ্ছেন। রাঙা কাকিমা আবার হাসছেন।

দু' হাত দিয়ে চন্দনার মুখখানা তুলে ধরে অম্বর বলল, 'একটা কথা বলব?'

'বলো।'

'দুজনের একটা ছবি তুলবে?'

চন্দনা হাসল। 'দেখে আশা মিটছে না?'

'বল না তুলবে কিনা?'

'তোমার খুব ইচ্ছে করছে বুঝি?'

'হ্যাঁ। দারুণ।'

'বেশ, তুলবো।'

ঠিক দিন, ঠিক সময়ে চন্দনা এলো। সুন্দর ডোরাকাটা একটা তাঁতের শাড়ী, কপালে বিরাট একটা টিপ, মাথায় খোঁপা। ঠোঁটেও বোধহয় ন্যাচারাল কলারের লিপস্টিক বুলিয়েছে তবে বোঝা যাচ্ছে না। দরজা খুলে দিতেই অম্বর অবাক। মুগ্ধ।

'কি হলো? ভিতরে ঢুকতে দাও।'

অম্বর কোন জবাব না দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়াতে কামড়াতে আগের মতোই মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

'কি আশ্চর্য! ভিতরে যেতে দেবে না?'

'চন্দনা!' অম্বর একটা ছোট্ট দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

'কি?'

'কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে।'

'খুব ভাল কথা। এখন সরে দাঁড়াও তো।'

অম্বর সরে দাঁড়াল। চন্দনা ঘরে ঢুকল।

'তোমার পাশে দাঁড়িয়ে কিভাবে ছবি তুলব ?' অম্বর হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল।

'একটু বেশী সুন্দর দেখতে বলে তোমার বড় বেশী অহংকার হয়েছে।'

'আমাকে সুন্দর দেখতে ? কে বলল তোমাকে ?'

'সবাই বলে।'

'সবাইটা কারা ? তুমি আর তোমার বাবা-মা ?'

'আমাদের কথা বাদ দাও। অন্য যাঁরাই দেখেন তাঁরাই বলেন।'

'সেই তাঁরাটি কারা ?'

'এই তো সেদিন কর্নেল মাসিমা তোমার রূপের কি দারুণ প্রশংসা করলেন।'

'কর্নেল মাসিমা ?'

'হ্যাঁ।'

'মাসিমা আবার কর্নেল।'

চন্দনা অম্বরকে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, 'মাসিমা আবার কর্নেল হবেন কেন ? মেসোমশাই কর্নেল বলে মাসিমাকে কর্নেল মাসিমা বলি।'

অম্বর হাসতে হাসতে বলল, 'তাই বলো। মেয়ে পুলিশ দেখেছি কিন্তু মাসিমারাও যে কর্নেল হতে শুরু করেছেন, তা তো কোনদিন শুনি নি ..'

'আগে তুমি যেমন গম্ভীর থাকতে আজকাল তেমনি অসভ্য হয়েছো।'

স্টুডিওতে যাবার পথে অম্বর জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার মেসোমশাই কর্নেল তা তো জানতাম না।'

'ইনি আমার নিজের মাসিমা না।'

'তবে ?'

'হায়দ্রাবাদে থাকার সময় আলাপ হয়েছে।'

'তাই বলো।'

'তবে আমাদের সঙ্গে খুব বেশী ঘনিষ্ঠতা।' চন্দনা ঘাড় ঘুরিয়ে অম্বরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি সেদিন মাসিমাকে দেখ নি ?'

'না তো।'

উনি তোমাকে দেখেছিলেন। তারপর কি দারুণ প্রশংসা।'

'হঠাৎ?'

'থাক! নিজের প্রশংসা অত শোনে না।'

স্টুডিওতে গিয়ে ভারি মজা হলো। দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে। ক্যামেরাম্যান ক্যামেরার ভিউ-ফাইণ্ডারে দেখে নিয়ে ওদের সামনে এসে বলল, 'না, না, ঠিক ভাল লাগছে না।'

ওরা দুজনে এবার দুজনকে দেখে নিল।

ক্যামেরাম্যান বললেন, 'ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড, আপনাদের দুজনকে ঠিক করে দাঁড় করিয়ে দেব?'

অম্বর শুধু বলল, 'দিন।'

ক্যামেরাম্যান ওদের দুজনকে খুব নিবিড়ভাবে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আলো ঠিক করলেন। তারপর ক্যামেরার কাছে ফিরে গিয়ে ভিউ-ফাইণ্ডারে দেখলেন। 'লাভলি!' ভিউ-ফাইণ্ডার থেকে দৃষ্টি তুলে বললেন, 'আফটার অল ইয়াং কাপল্'এর ছবি। একটু রোমান্টিক না হলে কি ভাল লাগে!'

অম্বর আর চন্দনা মুগ্ধ দৃষ্টিতে মুহূর্তের জন্য দৃষ্টি বিনিময় করল।

ক'দিন পরে ছবি ডেলিভারী নেবার সময় কাউণ্টারের ভদ্রলোক বললেন, 'খুব সুন্দর হয়েছে ছবিটা। একটা ছবি আমরা শো-কেশ-এ রাখতে পারি?'

কথাটা শুনে খুশী হলেও অম্বর বলল, 'এখন না। কিছুকাল পরে রাখবেন।'

শরতের টুকরো টুকরো মেঘের মতো আপন গতিতে ভেসে যায় দিনগুলো।

'জান চন্দনা, তোমাকে কিছু দিতে পারি না বলে ভীষণ খারাপ লাগে।'

'ব্যস্ত হচ্ছো কেন? সারা জীবনই তো তুমি দেবে।'

তবু ইচ্ছে তো করে। তাছাড়া তুমি আমাকে কত কি দিয়েছ?'

'আমি দিয়েছি বলেই তোমাকে দিতে হবে?'

'তা বলছি না। কাউকে তো কিছু দেবার সুযোগ পেলাম না, তাই তোমাকে অনেক কিছু দিতে ইচ্ছে করে।'

'আবার মন খারাপ করছ?'

'মন খারাপ করছি না। তবে মনে হয়।' অম্বর লুকিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'আমি রোজগার করার আগেই তো দাদু, নতুন মা—সবাই চলে গেলেন; এমন কি নিজের একটা ছোট ভাই-বোনও নেই যে তাদের কিছু দেব।'

'আমি তো আছি। তবে আবার কেউ নেই বলছ কেন?'

তুমি তো নিশ্চয়ই আছো; তুমি আছো বলেই তো হাসতে পারছি।' একবার চন্দনার দিকে তাকিয়ে অম্বর বলল, 'আমি সত্যি ভাগ্যবান। তা না হলে তোমাকে পাই?'

'তোমার চাইতে আমার ভাগ্য অনেক ভাল।'

'কেন?'

'মেয়ে হয়ে জন্মেছি, তখন স্বামী একটা জুটবেই। কিন্তু তোমার মতো স্বামী পাওয়া সত্যি ভাগ্য না থাকলে হয় না।'

'তুমি আমাকে বড় বেশী ভাল মনে কর।'

'নিশ্চয়ই মনে করি আর সেইজন্যই তো বুক ফুলিয়ে এগিয়ে চলেছি। মনের মধ্যে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা সঙ্কোচ থাকলে এমনভাবে তোমাকে চাইতাম না।'

'কি বলছ তুমি?'

'ঠিকই বলছি অম্বরদা। ছেলেরা হঠাৎ অনেক কিছু করতে পারে, কিন্তু মেয়েরা বড় স্বার্থপর। অনেক ভেবে-চিন্তে তারা এগিয়ে থাকে।'

'কাকু বা রাঙা কাকিমা কিছু জানেন নাকি?'

'না। আগে এম-এ পাস করে নিই। তারপর বলব।'

'সেই ভাল।'

'তুমি বিশুদাকে কিছু বলেছ?'

'না, কিছু বলি নি। ভেবেছি আগে তোমাদের সঙ্গে আলাপ করাই, তারপর আস্তে আস্তে বলব।'

'সত্যি। বিশুদা একদিনও এলো না তো?'

'ওকে অনেকবার বলেছি। কিন্তু কিছুতেই যেতে চায় না।'

'এমনই মজার ব্যাপার যে তোমার এখানেও কোনদিন ওর সঙ্গে দেখা হলো না।'

'ওর তো আসা-যাওয়ার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। তাছাড়া আজকাল ও কম আসে।'

'কেন?'

'একটা প্রমোশন পেয়ে ওর দায়িত্ব বেশ বেড়ে গেছে। তাছাড়া প্রায় প্রত্যেক মাসেই বোম্বে যায়।'

মাস খানেকের মধ্যেই হঠাৎ ওলট-পালট হয়ে গেল সব কিছু। দুপুরের পর অম্বরের অফিসে গিয়ে বিশু হাজির হয়ে বাড়ির চাবিটা নিল। বলল, 'তাড়াতাড়ি আসিস।' এমনি কপাল সেদিনই ওর ফিরতে দেরি হলো।

অম্বরকে দরজা খুলে দিয়েই বিশু পাগলের মতো চীৎকার করে বলে উঠল, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে।'

ঘাবড়ে গিয়ে অম্বর জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে?'

'কি হয় নি তাই বল।'

'আরে কি হয়েছে বল।'

'চন্দনা এসেছিল।'

'তাতে কি হলো?'

'আমার বারোটা বাজিয়ে গেছে।'

'তার মানে?'

'তুই ব্যবস্থা কর।'

'কি ব্যবস্থা করব?'

'বিয়ের।'

বিশুর কথা শুনে অম্বরের মনে হলো ভূমিকম্পে সারা দিল্লী শহরটা তলিয়ে গেল। তবুও নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল, 'তোর কি মাথা খারাপ হলো?'

'তুই ভাল করে চন্দনাকে দেখেছিস?'

'হ্যাঁ দেখেছি।'

'ওকে দেখে মাথা খারাপ হবে না?'

'তোর কি হলো বল তো?'

'রিয়েলি অম্বু, ওকে দেখে আমার মাথা ঘুরে গেছে।' তারপর বলল, 'ওকে দেখলে সত্যি কারুর মাথার ঠিক থাকতে পারে না।'

বিশুর কথাবার্তায় অম্বর পাথর হয়ে গিয়েছিল। তবু বলল, 'কই, আমি তো হই নি।'

'আরে তুই তো একটা সাধু!'

অম্বর মনে মনে বলল, আমি সাধু? আমি রক্ত-মাংস দিয়ে গড়া মানুষ নই? আমি বুঝি ভালবাসতে জানি না? আমার বুঝি ভালবাসা পেতে নেই? নাকি আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো মরে গেছে? ইচ্ছা করল আরো অনেক কথা বলতে, কিন্তু পারল না। চেষ্টা করেও পারল না। হাজার হোক বিশু! নতুন মার ছেলে! মুখে শুধু বলল, তুই জানিস আমি সাধু?'

'তোর কথা আমি জানি না?'

'আমার সব কিছু জানিস?'

'জানি বলেই তো বললাম তুই একটা সাধু।'

'তাছাড়া তুই বোধহয় জানিস না...'

বিশু কি যেন বলতে চেয়েছিল, কিন্তু অম্বর শোনে নি, শুনতে চায় নি। আর কিছু শোনার মতো মন ওর ছিল না।

পরের রবিবার সকালবেলায় পবিত্রবাবু আর স্ত্রী এলেন অম্বরের কাছে। পবিত্রবাবু বললেন, জানিস তো অম্বু, আমি সামনের বছর রিটায়ার করছি?'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। তাই ভাবছি রিটায়ার করার আগেই মেয়েটার বিয়ে দিয়ে দিই। তাছাড়া আমি হার্ট পেসেন্ট। কখন কি হয়...'

রাঙা কাকিমা বাধা দিলেন, 'আঃ! আবার ঐসব কথা। তুমি চুপ

কর, আমি বলছি।'

'হ্যাঁ', তারপর রাঙা কাকিমাই বললেন, 'হেনার খুব ইচ্ছে ছিল ওর একটা মেয়ে হোক। কিন্তু তা যখন আর হলো না তখন ও ঠিক করেছিল খুকুর সঙ্গে বিশুর বিয়ে দেবে। খুকুকে তো ও দারুণ ভালবাসত...'

অম্বর অবাক হয়। 'তাই নাকি? এসব তো আমি জানতাম না।'

'আমি তোকে বলব বলব ভাবছিলাম, কিন্তু বলা হয় নি।' একটু থেমে কাকিমা বললেন, 'এই জন্যই তো এতবার বিশুর খোঁজ করছিলাম। হাজার হোক অনেক কাল আগেকার কথা। কিন্তু কেমন হয়েছে বা ও কথা রাখবে কিনা ভেবে তোকেও আর কিছু বলি নি।'

অম্বর মাথা নিচু করে সব শুনছিল।

'সেদিন খুকুর কাছে শুনলাম বিশুর সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল। বাড়িতে ফিরে খুব বিশুর কথা বলল...'

অম্বর একটু শুকনো হাসি হেসে জানতে চাইল, 'কি বলল?'

'বলল বিশু নাকি দারুণ ইণ্টারেস্টিং হয়েছে, ভীষণ হাসি-খুশী...'

'ঠিকই বলেছে।'

পবিত্রবাবু বললেন, 'তাই ভাবছি, একবার ভূপাল গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করি। তাই বলছিলাম তুই যদি আমার সঙ্গে যেতে পারতিস তাহলে খুব ভালো হতো।'

সঙ্গে সঙ্গে অম্বর বলল, 'কাকু, আমি তো একদিনও ছুটি পাব না। অফিসে দারুণ কাজের চাপ।'

'আমি একলা গেলে ও কিছু মনে করবে না তো?'

'না, না, ও সে ধরনের ছেলেই না।'

পবিত্রবাবু ভূপাল থেকে ফিরে আসার পর চন্দনা যখন সব কিছু শুনল জানল তখনই ছুটে এসেছিল অম্বরের কাছে। 'একি হলো অম্বরদা?'

অম্বর দু-হাত দিয়ে চন্দনাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, অদৃষ্ট চন্দনা। অদৃষ্ট। এর হাত থেকে কারুর মুক্তি নেই।'

চন্দনা কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'কিন্তু এ হতে পারে না অম্বরদা। কিছুতেই হতে পারে না।'

'মানুষের জীবনে সব কিছু হতে পারে চন্দনা।' চন্দনার মাথার উপর নিজের মুখখানা রেখে অম্বর বলল, 'তাছাড়া বিশুকে নিয়েও তুমি সুখী হবে।'

'অমন সুখ আমি চাই না। আমি তোমাকেই চাই অম্বরদা।'

'আমি তো রইলাম চন্দনা। সারা জীবনই তোমাকে আমি ভালবাসব।'

'কিন্তু...'

অম্বর আর কিছু বলতে পারল না। সমস্ত শক্তি দিয়ে চন্দনাকে জড়িয়ে ধরে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

একটা বুকভরা আশা, প্রাণভরা স্বপ্ন চিরদিনের মতো হারিয়ে গেল।

পাঁচ

মাটির তলায় একটা হরপ্পা একটা মহেঞ্জোদাড়ো পাওয়া গেছে। হয়তো অমনি আরো কয়েকটা স্বপ্ন মাটির তলায় চাপা পড়ে আছে। প্রত্নতাত্ত্বিকরা একদিন না একদিন তাদের আবিষ্কার করবেনই। কিন্তু মানুষের—প্রত্যেক মানুষের মনের মধ্যে যে স্বপ্ন, যে আশা, যে ইতিহাস সাফল্য-ব্যর্থতার কাহিনী চাপা পড়ে আছে, তাদের হদিশ কি কেউ কোনদিন পাবে?

বোধহয় না।

কুন্দন সিং চলে গেছে। অম্বরও অফিসে চলে গেল। মিঠু কয়েকটা জিনিস কেনাকাটা করতে খান মার্কেট গিয়েছিল। সুজন সিং পার্কের কম্পাউণ্ডে ঢুকতেই বীরেনের সঙ্গে দেখা। 'কখন এলে?' মিঠু জিজ্ঞাসা করল।

'কাল সন্ধ্যার পরই তো আমরা ফিরে এসেছি।'

'তাই নাকি?' একটু থেমেই মিঠু বলল কাল সকালেই ব্যালকনিতে বসে ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে আমরা তোমার কথা বলছিলাম।'

'আমি তো আপনার ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম। কিন্তু আপনারা ছিলেন না।'

'কখন?'

'তখন বোধহয় আটটা-সাড়ে আটটা বাজে।'

'আই অ্যাম সো সরি। আমরা বিশুদা আর চন্দনার সঙ্গে বেরিয়েছিলাম।'

'কাল তো রবিবার ছিল। না থাকারই কথা।'

'এসো। আইসক্রীম খাওয়াব।'

খুশীতে ঝলমল করে উঠল বীরেন, 'রিয়েলি?'

'আমি তোমাকে মিথ্যে কথা বলব? যেই শুনলাম তোমার বাবা মা চণ্ডীগড় যাচ্ছেন তখনই জানি তুমি আসবে..'

'জানতেন?'

'জানতাম বলেই তো তোমার জন্য আইসক্রীম করে ডীপফ্রিজে রেখে দিয়েছি।'

'আপনি যান। আমি এই চিঠিটা পোস্ট করে আসছি।'

মিঠু উপরে এসে কিচেনে জিনিসপত্রগুলো রাখতে না রাখতেই বেল বাজল। ও দরজা খুলে বীরেনকে দেখেই বলল, 'এসো।'

বীরেন ভিতরে এসে বসল না। বিরাট লিভিংরুমের মধ্যে পায়চারি করতে শুরু করল।

মিঠু রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে বলল, 'এক্ষুনি আসছি।'

'কিচ্ছু ব্যস্ত হবেন না।'

কয়েক মিনিট পরেই মিঠু লিভিংরুমে ঢুকতেই বীরেন বলল, 'এত বড় ফ্ল্যাটে আপনি সারাদিন একলা একলা থাকেন কিভাবে?'

মিঠু হাসতে হাসতে বলল, 'এখন তো মাসখানেক তোমার সঙ্গে গল্প-গুজব করে কাটানো যাবে। তারপর আবার ভেবে দেখব।'

'একমাস না, ঠিক ছ-সপ্তাহ ছুটি।'

'তাহলে তো আরো ভাল কথা।'

'কিন্তু ছ-সপ্তাহ বেশী যে আইসক্রীম খাওয়াতে হবে?' বীরেন মজা

করে জিজ্ঞাসা করল।

'এখন আইসক্রীম ঠিকই পাবে কিন্তু পাস করার পর ফি দেব না।'

'তাই বলুন।'

মিঠু ফ্রিজ খুলে আইসক্রীম বের করে দিল। 'নাও।'

'আপনার?'

'আমি তোমার মতো অত আইসক্রীম খাই না।'

'অত না খেলেও একটু তো খাবেন।'

'আইসক্রীম খেলেই ভীষণ দাঁত শিরশির করে।'

তো বাঙালী।...'

'তাতে কি হলো?'

'রোজ তো মাছ খান। ক্যালসিয়াম...'

'না, না, রোজ মাছ খাই না।'

বীরেন যোশী অবাক হয়। 'সে কি?'

'মাছ খেতে আমার তত ভাল লাগে না।'

'রোজ দুধ বা মাংস খান?'

'মাংস প্রায়ই খাই, তবে দুধ খাই না।'

অভিজ্ঞ ডাক্তারের মতো বীরেন বলল, 'তাহলে তো ক্যালসিয়ামে ডেফিসিয়েন্সী হবেই।'

'পরে ক্যালসিয়ামের কথা ভেবো। এখন খাও।'

'আমি একলা একলা খাব?'

'তাতে কিছু হবে না।'

এক চামচ আইসক্রীম মুখে দিয়েই বীরেন বলল, 'দারুণ হয়েছে।'

'সত্যি ভাল হয়েছে?'

'সত্যি বলছি দারুণ হয়েছে।'

আইসক্রীম খাওয়া শেষ করে বীরেন বলল, 'আমি ছুটিতে এলেই

আপনাকে ভীষণ বিরক্ত করি, তাই না ?'

মিঠু হাসতে হাসতে জবাব দেয়, 'বিরক্ত কেন করবে ? বরং আমারই বেশ সময় কাটে। নয়ত দিনটা যেন ফুরুতে চায় না।'

'আপনি না থাকলে আমারও একই অবস্থা হতো। বরাবর বাইরে লেখাপড়া করায় দিল্লীতে আমার একজনও বন্ধু নেই।' বীরেন একটু থেমে আবার শুরু করে, 'হোস্টেলে থেকে থেকে এমন হ্যাবিট হয়ে গেছে যে কিছুতেই একলা থাকতে পারি না। সব সময় হৈ-হুল্লোড় না হলে ভাল লাগে না।'

'ছেলেরা একটু হৈ-হুল্লোড় না করলে কি ভাল লাগে।'

'আপনার ভাল লাগে ? মা তো ভীষণ বিরক্ত হন।'

'না, না, বিরক্ত হবেন কেন ?'

'সত্যি ভীষণ বকাবকি করেন। তাইতো যখন তখন আপনার এখানে চলে আসি।'

'তোমার বাবা-মা কিন্তু সত্যি খুব ভাল লোক।'

'এমনি খুব ভাল। তবে বড় বেশী কোয়ায়েট। একটুও চেঁচামেচি সহ্য করতে পারেন না।'

'খুব ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ তো।'

বীরেনের হঠাৎ খেয়াল হয় অনেকক্ষণ গল্প করছে। 'এবার উঠি ; অনেকক্ষণ আপনাকে আটকে রেখেছি।'

'আমার কি কোন কাজ আছে যে আটকে রেখেছ ?'

'দাদা লাঞ্চে আসবেন না।'

'না। ও সকালেই খেয়ে যায়।'

'আপনি তো স্নান খাওয়া-দাওয়া করবেন ?'

মিঠু হাতের ঘড়ি দেখে বলল, 'এখন তো মোটে সাড়ে এগারোটা বাজে ?'

'মোটে সাড়ে এগারোটা ?'

'তুমি কি ভেবেছিলে ?'

'আমি ভেবেছিলাম একটা বেজে গেছে।'

মিঠু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'বসো, একটু কফি করি।'

কফি খাবার পর বীরেন চলে গেল।

মিঠুর বেশ লাগে ওকে। ছিমছাম সুন্দর চেহারা। দেখলেই মনে হয় ভাল ক্রিকেট খেলতে পারে। সব সময় মুখে হাসি। তবে একটু চঞ্চল। পাঁচ মিনিটও চুপ করে বসে থাকতে পারে না। যোশীজী প্রায় সব সময়ই বলেন, 'এত চঞ্চল হলে ডাক্তারী করবি কি করে?' বীরেন জবাব দেয় না, শুধু হাসে। মিঠুর এখানে এসেও গল্প করতে করতে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াবে, এটা-ওটা দেখবে আর একটার পর একটা প্রশ্ন করবে। মিঠু কখনো উত্তর দেয়, কখনো শুধু হাসে। শেষে বীরেন বলে, 'যাইহোক, বাঙালীরা খুব মিশুকে হয়।'

'তুমি বুঝি অনেক বাঙালী ফ্যামিলীর সঙ্গে মিশেছে?'

'না। মিশেছি শুধু আপনাদের সঙ্গেই। তবে বাঙালীদের কথা অনেক শুনেছি।'

'আমরা বুঝি খুব মিশুকে?'

'নিশ্চয়ই।' বীরেন একবার মিঠুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার মতো মিশুকে মেয়ে পাওয়া তো প্রায় অসম্ভব।'

'তাই নাকি?' খুশীতে মিঠু প্রশ্ন করে। সঙ্গে সঙ্গে বলে, 'কত মেয়ের সঙ্গে মিশেছ যে এমন কমপ্লিমেণ্ট দিতে পারলে?'

বীরেন একটু লজ্জা পায়। 'আমার ধারণা বলেই বললাম।' একটু থেমে আবার বলল, 'দাদা তো ভালো আর্কিটেক্ট, এত ভাল চাকরি করেন অথচ কথাবার্তা কি সুন্দর।'

মিঠু আবার হাসে, 'তাহলে দাদাও ভাল, আমিও ভাল?'

'ভালই তো।'

মিঠু একটু পাশের ঘর ঘুরে আসতেই বীরেন বলল, 'দাদা আমাকে কি বলে ডাকেন, জানেন?'

'কি বলে?'

'আইসক্রীম ডক্টর বলে।'

'কই, আমি তো কোনদিন শুনি নি।'

'অফিস যাবার সময় প্রায় রোজই আমার সঙ্গে দাদার দেখা হয়। আর দেখা হলেই আইসক্রীম ডক্টর বলবেন।'

'নামটা কিন্তু ঠিকই দিয়েছে।'

বিকেলের দিকে, সন্ধ্যার পর বীরেনের দেখা পাওয়া যায় না। রোজ কনটপ্লেসে ঘুরবে, জনতা কফি হাউসে আড্ডা দেবে। অথবা সিনেমা। এ বাড়িতে আসে সকালে, দুপুরে।

অম্বর চলে যাবার কিছুক্ষণ পরে কুন্দন সিং চলে গেল। মিঠু ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে চুলের জট ছাড়াচ্ছিল। অনেকদিন শ্যাম্পু করা হয় নি। তারপর একদিন ভালভাবে না আঁচড়াতে পারলেই জট পড়ে। হঠাৎ বেল বাজতেই মিঠু দরজা খুলে দেখল বীরেন। 'এসো।'

মিঠুর পিছন পিছন আসতে আসতে বীরেন জিজ্ঞাসা করল, 'বাথরুমে যাচ্ছেন?'

'চুলের জট ছাড়াচ্ছি।'

মিঠুর চুলের দিকে তাকিয়ে বীরেন বলল, 'বাপরে বাপ! কি দারুণ চুল আপনার!'

'তুমি বলছ দারুণ কিন্তু সামলাতে আমার জান বেরিয়ে যায়।' চুলের মধ্যে মোটা চিরুনি টানতে টানতে মিঠু জবাব দিল।

'কেন?'

'একদিন ভালভাবে না আঁচড়ালেই এমন বিশ্রী জট পড়ে যে রাগের চোটে সব চুল কেটে ফেলতে ইচ্ছে করে।'

'এমন সুন্দর চুল কেউ কাটে?'

'আর সুন্দর বলো না। আমার তো প্রাণ বেরিয়ে যায়।' চুলের গোছা বুকের সামনে ধরে খুব জোরে চিরুনি টানতে টানতে মিঠু বলে।

'তাহলে অন্য মেয়েরা কি করে?'

'রেগুলার আঁচড়ালে আর শ্যাম্পু করলে আর জট পড়ে না।'

'আপনি করেন না কেন?'

'এত চুল যে নিজে নিজে ঠিক শ্যাম্পু করতে পারি না।'

'আমি হেলপ্ করব?'

ওর কথা শুনে মিঠু না হেসে পারে না। 'না, না, তুমি কি পার নাকি?'

'না পারার কি আছে?'

'না, না, তোমাকে কিছু করতে হবে না। আমি চুলটা আঁচড়েই কফি করছি।'

বীরেন ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। মিঠু চুল আঁচড়ায়। কিছুক্ষণ চুল আঁচড়াবার পর মিঠু বলল, 'এত বেশী চুল উঠে যাচ্ছে যে কিছুদিন পরে বোধহয় ন্যাড়া হয়ে যাব।'

বীরেন সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারী করতে শুরু করে, 'সেদিন বললেন আইসক্রীম খেতে দাঁতে শিরশির করে, আজ বলছেন চুল উঠে যাচ্ছে। আপনার ডেফিনিটলি ভিটামিন-ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সী হয়েছে।'

নিটোল সুন্দর হাতটা এগিয়ে ধরে মিঠু বলল, 'এদিকে তো দিনের দিন ফুলছি।'

'মোটেও আপনি ফুলছেন না।'

'সত্যি মোটা হচ্ছি। পেটে কি দারুণ চর্বি হয়েছে।'

'ছেলেদের চাইতে মেয়েদের চর্বি একটু বেশীই হয়। তাছাড়া আপনি নিশ্চয়ই কোন এক্সারসাইজ করেন না?'

'কি আবার এক্সারসাইজ করব?'

'কেন? স্কিপিং।'

'এই বুড়ো বয়সে স্কিপিং করব?'

বীরেন হাসতে হাসতে বলল, 'ওসব কথা ছাড়ুন। রোজ পাঁচ মিনিট করে স্কিপিং করুন, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'দাঁড়াও এখন কফি খাওয়া যাক। পরে তুমি ডাক্তারী কোরো।'

মিঠু রান্নাঘরে যায়। বীরেনও বসে থাকে না। একটু পরে রান্নাঘরে হাজির হয়। মিঠুর পাশে। হঠাৎ বলে, 'আপনি এত বেঁটে কেন?'

'আর কত লম্বা হবো?'

'সত্যি আপনি ভীষণ বেঁটে!' বীরেন মিঠুর পাশে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার চাইতে অন্তত চার-পাঁচ ইঞ্চি ছোট।'

'চার-পাঁচ ইঞ্চি না এক ফুট ছোট।'

'দেখুন না আপনি আমার কানের নিচে···' বীরেন একেবারে মিঠুর গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে দেখে।

মিঠুর একটু কেমন লাগে। বীরেন ওর চাইতে বয়সে ছোট। চার-পাঁচ কি হয়তো ছ' বছরের ছোট। তবু তো ইয়াংম্যান। তাছাড়া এর আগে কোনদিন এমন করে দাঁড়ায় নি। বীরেনের মধ্যে কিন্তু কোন সঙ্কোচ নেই। বিন্দুমাত্রও না।

'তুমি বয়সের তুলনায় একটু বেশী লম্বা। তাছাড়া রোগা···'

মিঠুর কথা শেষ করতে না দিয়েই বীরেন হেসে উঠল।

'হাসছ কেন?'

'আমি রোগা?'

'আমার চাইতে নিশ্চয়ই রোগা।'

বীরেন ঝপ্ করে মিঠুর একটা হাত ধরে বলল, 'মোটেও আমি আপনার চাইতে রোগা না।'

হঠাৎ মিঠুর মনে হলো, বীরেন অনেকটা মেজর ভরদ্বাজের মতো। ইনজেকশনটা নেবার সময় সারা হাত যেন অবশ হয়ে যেত। কিন্তু তারপরই মেজর ভরদ্বাজ মিঠুকে ধরে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে বলতেন, 'কি হলো মিস বেঙ্গল। বেশী লেগেছে?'

লাগত তো বটেই। কিন্তু মিঠু ওর কথায় মুখ নীচু করে হাসত। মেজর ভরদ্বাজের ঐ আন্তরিকতাটুকু বড় ভাল লাগতো।

হাজার হোক কর্নেল সাহেবের মেয়ে। মেজর ভরদ্বাজ যথেষ্ট খাতির করতেন। প্রথম দিন মার সঙ্গে গিয়েছিল, কিন্তু তারপর একাই চলে যেত। রোজ না, তবে সপ্তাহে অন্তত একদিন মেজর বলতেন, মিস বেঙ্গল, একটু যে শুতে হবে। পেটটা একটু দেখতাম।

মিঠু টেবিলের উপর শোবার সময় মেজর হাসতে হাসতে বলতেন, কর্নেল সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন আমি আগে ভীষণ সাই ছিলাম। কিন্তু বিলেতে পড়তে গেলে এক প্রফেসর একদিন বললেন মেয়েদের পরীক্ষা করার সময় হাসব্যাণ্ডের মতো ফ্রি হতে হবে।

মিঠু শুয়ে শুয়ে হাসত। কোমরের কাপড় একটু নামিয়ে দিত। মেজর এবার ওর পেট টিপে টিপে দেখতেন। মিঠুর সারা শরীরটা শিরশির করে উঠত।

'কি, লজ্জা করছে?' মিঠুর উত্তরের অপেক্ষা না করেই মেজর ভরদ্বাজ বললেন, 'আমারও লজ্জা করছে কিন্তু কি করব? মিস বেঙ্গলের অসুখ না হলে তো এসব ঝামেলা হতো না।'

ওর কথাবার্তা মিঠুর ভারী ভাল লাগতো। বড় সতেজ, সজীব লাগতো। ক্যান্টনমেনটের মধ্যে যাতায়াতের সময় দেখা হলেই মিঠু জিজ্ঞাসা করত, 'কেমন আছেন, মেজর সাহেব?'

মেজর ভরদ্বাজ মজা করে বলত, 'আপনার মতো রোগী পেলে আমার মতো ছোকরা ডাক্তার ভালই থাকে।'

মিঠু মুখ টিপে টিপে হাসতে হাসতে চলে যেত।

আগে ইনজেকশন নিতে মিঠুর ভয় ছিল, কিন্তু পরে ছিল না। ওর মা জিজ্ঞাসা করতেন, 'হ্যাঁরে মিঠু, ইনজেকশন নিতে খুব ব্যথা লাগে নাকি রে?'

মিঠু গম্ভীর হয়ে বলতো, 'লাগলে কি করব? ঐ ব্যথায় কষ্ট পাবার চাইতে ইনজেকশন নেওয়া অনেক ভাল।'

'তা তো বটেই।'

মিঠু মাকে বলতে পারত না, ভাল লাগত মেজর ভরদ্বাজকে। কি সুন্দর [illegible] কথাবার্তা তা তো তুমি জান না। তাছাড়া কি দারুণ হ্যাণ্ডসাম!

ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটিতে ওর সঙ্গে যেসব মেয়েরা পড়ত, তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের বিয়ে হয়ে গেল। মিঠু নিজের বিয়ের কথাও ভাবতো। লোভ হতো মেজর ভরদ্বাজের মতো একটা স্বামী পাবার। এসব কথা কাউকে বলত না, বলতে পারত না। বলা যায় না।

'ব্যথা লাগছে?' মিঠুর পেট টিপতে টিপতে মেজর জিজ্ঞাসা করলেন।

'আগের চাইতে কম।'

'তাহলে আগের চাইতে ভাল আছেন, কি বলুন?'

'হ্যাঁ, আগের চাইতে ভাল আছি।'

মেজর ভরদ্বাজ হাসতে হাসতে বললেন, বুড়ো ডাক্তার চিকিৎসা করলে কিন্তু এত তাড়াতাড়ি সারত না।'

মিঠু হাসতো। 'আমার তো মনে হয় আপনিও ইচ্ছে করে দেরি করাচ্ছেন।'

'কি করব বলুন? আপনার মতো রোগী কি হাতছাড়া করতে ইচ্ছে করে?'

মন চেয়েছিল ডাক্তারকে বিয়ে করতে, কিন্তু হলো না। বিয়ে হলো আর্কিটেক্টের সঙ্গে। ইয়াং আর স্মার্ট ডাক্তার দেখলে এখনও মিঠুর মনে পড়ে হায়দ্রাবাদের দিনগুলোর কথা। মেজর ভরদ্বাজের কথা। অফিসার্স ক্লাবের অ্যানুয়াল ক্লাব-এ মেজর এসে হঠাৎ ওর হাত ধরে টেনে বলল, 'একি। আজকে চুপচাপ বসে?'

মিঠু নাচতে পারত না। জানতো না। তবু উঠেছিল। কোন রকমে নেচেছিল মেজরের সঙ্গে।

'বিলেতে গিয়ে বোধহয় মেয়েদের সঙ্গে নাচতেন?' স্লো স্টেপিং করতে করতে ফিসফিস করে মিঠু জানতে চাইল।

'মাঝে মাঝে নেচেছি। কিন্তু আপনার মতো মিস বেঙ্গল তো কপালে জোটে নি।

'কিন্তু ওদের সঙ্গে নাচার পর কি আমার সঙ্গে নেচে মন ভরবে?'

'মন ভরাবার মালিক তো আপনি।' মেজর মিঠুর কোমর ধরে একটু বেশী নিবিড় হয়ে বলল।

মিঠু একবার মেজরের দিকে তাকিয়েই দৃষ্টিটা নামিয়ে নেয়।

অম্বর ওকে ভালবাসে কিন্তু ঠিক এই পৌরুষ, এই বলিষ্ঠতা নেই। অম্বর যেন ওর কাছে ভিক্ষা চায়, দাবি করতে পারে না। পুরুষের পৌরুষটাই তো মেয়েদের সব চাইতে ভাল লাগে, তা বোধহয় ও জানে না।

ঐ অত লোকের ভিড়ের মধ্যেও মেজর ভরদ্বাজ এক ফাঁকে ওর

চিবুকে একটু চুমু খেয়েছিল। শিউরে উঠলেও ভাল লেগেছিল। খুব ভাল, দারুণ ভাল। এমন ভাল আর যেন কোনদিন লাগে নি।

বীরেন হঠাৎ হাত ধরায় সব মনে পড়ল মিঠুর। এর আগে টুকরো টুকরো কথা, স্মৃতি মনে এসেছে। কিন্তু আজ যেন সব মনে এলো। প্রথম যৌবনের আনন্দ উত্তেজনা আর রোমাঞ্চের ঢেউ বয়ে গেল মনের উপর দিয়ে, দেহের উপর দিয়ে। মিঠু একবার বীরেনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আয়নার সামনে একবার পাশাপাশি দাঁড়াব।'

'আয়নার সামনে দাঁড়ালে তো আর আপনি মোটা হবেন না।'

'আগে কফি খাই তারপর দেখা যাবে কে মোটা, কে রোগা।'

কফি খেতে খেতে বীরেন জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, দাদা জানেন, আমি সারাদিন আপনার সঙ্গে আড্ডা দিই?'

'দাদা জানলে কি হয়েছে?'

'আফটার অল আপনি ইয়াং ও সুন্দরী...'

বীরেন হয়তো আরো কিছু বলত, কিন্তু পারল না। মিঠু হাসতে হাসতে ওর একটা কান ধরে বলল, 'এবার পিঠে দুম দুম করে কয়েকটা কিল মারব!'

'মারুন, কিন্তু কেন?'

'আমার সঙ্গে ফাজলামি হচ্ছে?'

'ফাজলামি করছি কোথায়?'

'তবে ওসব আজে-বাজে কথা বললে কেন?'

'আপনি ইয়াং না? আপনি সুন্দরী না?'

মিঠু পাল্টা প্রশ্ন করে, 'আমি ইয়াং? আমি সুন্দরী?'

বীরেন হাসে বলে, 'নিজের চোখ দিয়ে দেখছি আপনি ইয়াং ও সুন্দরী। অথচ বললেই দোষ?'

'আবার কান টানব?'

'যাই করুন, আপনি বেশ সুন্দরী।'

বীরেনের মুখে প্রশংসা শুনতে ভাল লাগে মিঠুর। মুখে বলে, 'আমি যাই হই, তোমার মত অত সুন্দর তো না।'

ছুটির দিনগুলো বেশ কাটে বীরেনের। হাল্কা মনে হয় মিঠুর।

সেদিন বীরেন হাতে একটা ক্যামেরা নিয়ে ঢুকল। মিঠু জিজ্ঞাসা করল, 'ক্যামেরা নিয়ে কোথায় গিয়েছিলে?'

'কোথাও যাই নি। আপনার ছবি তুলব বলে নিয়ে এলাম।'

'আমার ছবি তুলে কি করবে?'

'কেন দাদা বকবেন?'

'দাদা বকবেন কেন? কিন্তু আমার তুলে কি হবে?'

'কি আবার হবে? অ্যালবামে রাখব।'

হাজার হোক যৌবনের উচ্ছ্বাস। একটু বেহিসেবী হবেই। বীরেন একটার পর একটা ছবি তুলল মিঠুর। লিভিংরুমের এ কোণায়, সে কোণায়, ব্যালকনিতে, কিচেনে।

'এত ছবি তুলে কি করবে?'

'দাঁড়ান। এখনও অনেক বাকি।'

'সে কি?'

শোবার ঘরে বিছানায় উপুড় হয়ে বই পড়তে বলল মিঠুকে।

'এত কায়দা করে ছবি তোলা শিখলে কোথায়?'

'কেন, ফিল্ম ম্যাগাজিন দেখে।'

'কিন্তু আমি তো ফিল্ম স্টার না।'

'আপনি ফিল্ম স্টার না ঠিকই, তবে স্টার।'

'এসব কথা বললে কিন্তু ছবি তুলব না।' মিঠু অভিমান করে বলে।

বীরেন সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে আলতো করে এক হাত দিয়ে মিঠুকে একটু জড়িয়ে ধরে বলে, সরি! আর ওসব বলব না।'

একটা, দুটো, তিনটে, চারটে ছবি তোলে বীরেন। ক্যামেরার ভিউ-ফাইণ্ডারে দেখে মিঠুর মুখটা ঘুরিয়ে দেয়, হাতটা সরিয়ে দেয়, চুলগুলো একটু ঠিক করে। একবার সামনের দিকের শাড়ীটাও একটু টেনে-টুনে দিল। মিঠু কিছু বলল না। বলতে পারল না।

'এবার আপনার সঙ্গে আমি কয়েকটা ছবি তুলি?' বীরেন অনুমতি চাইল।

'কে তুলবে ?'

'সেলফ দিয়ে তুলব।'

'তোল।'

'কোথায় তুলবেন বলুন।'

'যেখানে তোমার ইচ্ছে।'

লিভিংরুমের সোফায় মিঠুকে বসিয়ে ক্যামেরা ঠিক করে নিয়ে বীরেন পাশে বসল। একটু ঘন হয়ে। ছবি উঠল।

'এবার একটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তুলি ?'

'তোল।'

আবার মিঠুকে দাঁড় করিয়ে ক্যামেরা ঠিক করে বীরেন পাশে এসে দাঁড়াল। খুব কাছাকাছি ডান হাত দিয়ে মিঠুকে জড়িয়ে।

এবার মিঠুর মনে একটু সন্দেহ হয়। বীরেন কি একটু বেশী এগুচ্ছে ? মেজর ভরদ্বাজের মতো এর মনের মধ্যেও কোন আশা, কোন স্বপ্ন লুকিয়ে নেই তো ? তবু ভাল লাগে। হয়তো একটু রোমাঞ্চও।

সত্যিই ছবিগুলো ভাল উঠল। মিঠু ভাবতে পারে নি এত ভাল ছবি বীরেন তুলতে পারবে। 'আমি সত্যিই ভাবি নি তুমি এত সুন্দর ছবি তুলতে পার।'

'তবু তো আপনার ভয়ে আমি ঠিক মতো তুলতে পারি নি।'

'তার মানে ?'

বীরেন শুধু হাসে।

'কি হলো হাসছ কেন ? বল।'

'একটু ফ্রি না হলে ঠিক ভাল ছবি তোলা মুশকিল। 'আমি ছিলাম কিন্তু আপনি ছিলেন না।'

'বাজে বকো না। তুমি যা বলেছ আমি তাই করেছি।'

'আমি তো বেশী অনুরোধ করতেও সাহস করি নি।'

'তাই নাকি ?'

'সত্যিই তাই।'

'ঠিক আছে। আরেক দিন তোলা যাবে।' একটু পরে মিঠু আবার

বলল, 'তোমায় দেখছি অনেক গুণ…'

'আপনি আমার অনেক গুণের পরিচয় দেখলেন কোথায় ?'

'ভাল ছাত্র, ভাল স্বভাব, ভাল ছবি তুলতে পার। আর কি পার তুমি ?'

'যা অন্য ছেলেরা জানে, আমিও সেইরকম কিছু কিছু জানি।'

'তবু শুনি।'

'সাঁতার কাটতে পারি, গাড়ী ড্রাইভ করতে পারি, একটু-আধটু নাচতে পারি।'

'তুমি নাচতে পার ?' মিঠু যেন হঠাৎ একটু উত্তেজিত হয়।

'একটু একটু।'

'একদিন দেখাবে ?'

'একলা একলা তো নাচা যায় না।'

'তুমি কোথায় শিখলে ?'

'বন্ধুবান্ধবের কাছেই শিখেছি। সঙ্গে সঙ্গে বীরেন জানতে চায়, আপনি নাচতে পারেন ?'

'না, তবে হায়দ্রাবাদে দু একদিন নেচেছি।'

'ব্যস! ব্যস। তাহলেই হবে।' বীরেন একবার মিঠুর সর্বাঙ্গ দেখে নিয়ে বলল, 'আপনার ফিগার তো ভাল আছে।'

আরো কটা দিন পার হয়। বীরেনের ছুটির মেয়াদ প্রায় ফুরিয়ে আসে। আবার ছবি তোলা হয়েছে। বেশী নয়, তিন-চারটে মাত্র। সত্যি ভাল হয়েছে।

'চণ্ডীগড় ফিরে যাবার আগে একদিন সত্যি নাচব।'

'আরে দূর। আমি পারব না।'

'খুব পারবেন। সবাই পারে, আপনি পারবেন না কেন ?

'তুমি কবে চণ্ডীগড় যাচ্ছ ?'

'পরশুর পরের দিন।'.

'এর মধ্যেই ছুটি ফুরিয়ে গেল ?'

'যাবে না ?'

পরের দিন ওর বাবার কয়েকটা কাজের জন্য বীরেন আসতে পারল

না। সময় পেল না। এলো তারপর দিন। চণ্ডীগড় ফিরে যাবার আগের দিন।

'কাল চলে যাচ্ছি। আজ কিন্তু সারা দুপুর উৎপাত করব।'

'উৎপাত আবার কি করবে?'

'আইসক্রীম খাব, কফি খাব, গুল্পগুজব করব, নাচব।'

'না নাচলে কি তোমার ঘুম হচ্ছে না?'

'আপনার অত যখন ভয় তখন আগে নাচটাই সেরে নিই।'

'সত্যিই আমি পারব না।'

'আমি বলছি পারবেন।'

'না, না, আমি পারব না। আমি কোনদিন...'

বীরেন কিছুতেই কথা শুনল না। মিঠুর হাত ধরে টেনে তুললো। 'রাম্বা নাচব! ভীষণ সিম্পল।'

'সত্যি বলছি আমি জানি না।'

তবু বীরেন থামল না। ও তো থামতে পারল না। সত্যি মিঠুর কোমরে আর কাঁধে হাত দিয়ে নাচতে শুরু করল। কি করবে? মিঠুও ওর কোমরে আর কাঁধে হাত রেখে ওর সঙ্গে সঙ্গে স্টেপ মেলাবার চেষ্টা করল? প্রথম দু-পাঁচ মিনিট সত্যি দারুণ অস্বস্তি হচ্ছিল মিঠুর।

তারপর?

ঠিক মেজর ভরদ্বাজের মতো বীরেন আরো একটু ওকে কাছে টেনে নিতেই মিঠু যেন ভিতরে ভিতরে একটু রোমাঞ্চ অনুভব করল।

'এই জানলা দিয়ে যদি কেউ দেখে?'

'বেশ তো। ও ঘরে যাচ্ছি।'

ও ঘরে কোথায় যাবে? বরং ওপাশে সরে যাই।'

স্টেপিং আর টার্ন নিতে নিতেই বীরেন মিঠুকে নিয়ে উল্টো দিকের কোণায় চলে গেল।

মিঠুর কানের কাছে মুখ নিয়ে খুব চাপা গলায় বলল, 'তবে যে বলছিলেন পারবেন না?'

'একি নাচ হচ্ছে? শুধু তোমাকে ধরে ঘুরে যাচ্ছি।'

'কে বলল নাচ হচ্ছে না?'

বীরেন আরো একটু কাছে টেনে নেয় মিঠুকে। দুটো দেহ প্রায় একসঙ্গে নাচে।

'জান, আমি এর আগেও একজন ডাক্তারের সঙ্গে নেচেছি।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

'হায়দ্রাবাদে।'

'তিনি কে?'

'বাবারই আণ্ডারে এক ইয়াং ডাক্তার ছিলেন, তার সঙ্গে।'

'তারপর আর কার সঙ্গে?'

'তারপর এই তোমার সঙ্গে।'

'রিয়েলি?'

'সত্যি আর কারুর সঙ্গে নাচি নি।'

'নাচতে ভাল লাগে না?' বীরেন প্রায় মিঠুর মুখের পর মুখ রেখে জিজ্ঞাসা করল।

'আনন্দ হৈ-হুল্লোড় করতে আমার খুব ভাল লাগে।'

'করেন না কেন?'

'করব কেমন করে? ও যে ভীষণ ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ।'

'সারা ছুটি আপনাকে বিরক্ত করলাম বলে আমার উপর খুব রাগ করেছেন তো?' নাচতে নাচতেই কথা হয়।

'রাগ করব কেন? বরং বেশ কাটল দিনগুলো।'

'ইউ আর লাভলি!' বলেই বীরেন মিঠুকে দু হাত দিয়ে বুকের মধ্যে টেনে নিল।

মিঠু কোন প্রতিবাদ করতে পারল না।

রাত্রে শোবার পর মিঠু অম্বরকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'তুমি সারা দিন

থাক না, আমি কিভাবে থাকি বলো তো ? আমার কষ্ট হয় না ?'

'আমি কি করি বল ? আমার যে অফিস আছে।'

'লাঞ্চের সময়ও একবার আসতে পার না ? আমি সারাদিন একলা একলা পড়ে থাকি, আমাকে যদি কেউ কোনদিন খুন করে রাখে তাহলেও তো তুমি জানতে পারবে না।'

'ওসব কথা বলে না।'

'তুমি বল এবার থেকে লাঞ্চে আসবে।'

'আসব।'

'ঠিক বলছ।'

'তোমাকে ছুঁয়ে বলছি আসব।'

পরের দিন রবিবার। অনেক বেলায় ঘুম ভাঙল হুজনের। কুন্দন সিং এসে বেল বাজাবার পরই মিঠু উঠল। অম্বর উঠল বিশু আর চন্দনা এসে ডাকাডাকি করার পর।

'একি অম্বরদা, এখনও বিছানায় ?' মুখ টিপে টিপে হাসতে হাসতে চন্দনা প্রশ্ন করল।

অম্বর কিছু বলার আগেই বিশু বলল, 'এই বিছানায় শুয়ে শুয়েই তো অতীত ভবিষ্যতের কত স্বপ্ন দেখে। উঠবে কি করে বল ?'

'তাই বলে এত বেলা পর্যন্ত ?'

'তুমি তো অবাক করলে চন্দনা ! তোমার অম্বরদাকে তুমি চেন না ?'

ছোট্ট ট্রেতে চার কাপ চা নিয়ে ঢুকতে ঢুকতে মিঠু বিশুর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। অম্বর আস্তে আস্তে বিছানায় উঠে বসল।

ট্রে থেকে এক কাপ চা নিয়ে বিশু বলল, 'এসো মিঠু, একটু তোমার পাশে বসি।' এবার চন্দনাকে বলল, 'যাও, তুমি তোমার অম্বরদার পাশে বসো।'

হাসতে হাসতে মিঠু বিশুর পাশে বসল, চন্দনা বসল অম্বরের পাশে।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বিশু মিঠুর কানে কানে বলল, 'সামনের ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় দেখ আমাদের তুজনকে কি সুন্দর মানিয়েছে ?'

মিঠু হাসল।

'হাসছ কেন? সত্যি বলছি আমাদের দুজনকে দারুণ মানায়।'

মিঠু হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার স্বামীর পাশে বুঝি আমাকে মানায় না?'

'যাই বল, ওর পাশে চন্দনাকেই বেশী মানায়।'

চন্দনা সঙ্গে সঙ্গে বিশুকে শাসন করল, 'এবার কিন্তু এক থাপ্পড় মারব।'

'তা মার কিন্তু যা সত্যি তাই বললাম।'

কেউ জানল না আগের দিন দুপুরে কনট্‌প্লেসে একটা স্টুডিওর শো-কেশ' এ বিশু চন্দনা আর অম্বরের সুন্দর একটা ছবি দেখেছে।